জলচল

ও

স্পর্শদোষ বিচার।

"জাতিভেদ," "শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার" এবং
"চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ" প্রভৃতি প্রণেতা—

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ
প্রণীত

জলচল

জলচল

ও

স্পর্শদোষ বিচার ।

— ·—·—·—

"জাতিভেদ," "শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার" এবং
"চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ" প্রভৃতি প্রণেতা—

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ

প্রণীত ।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা,

২নং বথুন রো,—ভারতমিহির যন্ত্রে

শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত ।

১৩৩১

[মূল্য ১৲ এক টাকা

সিরাজগঞ্জ হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

উৎসর্গ।

বিশ্বপিতা প্রেমময় ভগবানের স্নেহেব সন্তান হইয়াও
যাহারা সমাজের অবিচার ও অত্যাচারে সামাজিক
অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত হেয়,
অবজ্ঞাত ও দীন হীন ভাবে জীবনাতি-
বাহিত কবিতেছে, সেই সব জল অচল,
অনাচবণীয ভ্রাতৃবর্গেব কবকমলে
আমার বহু পরিশ্রমেব

জলচল ও স্পর্শদোষ বিচার

হৃদযেব গভীব সহানুভূতি, প্রেম ও
অনুরাগেব সহিত অর্পিত
হইল।

ভগবৎপাদপদ্মে নিয়ত উন্নতিকামী

—গ্রন্থকার

নিবেদন।

"জলচল ও স্পর্শদোষ-বিচার" প্রকাশিত হইল। সমা এই শোচনীয় অধঃপতনের সময় আপনার হীন জাত্যভিমান বিসর্জ্জন দিয়া সকলকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সমদর্শী ভগবান যে কাহাকেও ছোট বা অস্পৃশ্য করেন নাই, কাল প্রভাবে—কর্ম্মানুযায়ী ও সামাজিক নিয়মে এই সব ঘটিয়াছে ইহাই প্রতিপন্ন করিতে আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস। ফল ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। আমার জাতি-ভাইগণের বিদ্রূপ, শ্লেষ, তিরস্কার ও অভিসম্পাত আমি যেন আশীর্ব্বাদের দূর্ব্বাচন্দন পুষ্পমাল্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মাগণের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া আমি যেন কণ্টকময় বন্ধুর দুরারোহ শৈলপথে অটল ধৈর্য্য ও অসীম মনোবল লইয়া অগ্রসর হইতে পারি।

অধিক কিছু বলিবার নাই। যাহাদের জন্য পুস্তক লিখিয়াছি তাহারা পড়িলেই—আমার তৃপ্তি ও শান্তি। মুদ্রণে যে সব ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া গেল—পাঠকগণ তাহা মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। প্রুফ্ দেখার দোষে এসব হইয়াছে। যাঁহাদিগের পুস্তক, পত্রিকা ও প্রবন্ধ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি—তাঁহাদিগের প্রতি হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। পাঠকগণ কৃপা করিয়া—পুস্তক সম্বন্ধে আপনাপন অভিমত লিখিয়া জানাইলে অনুগৃহীত হইব। অর্থাভাবে পুস্তকের কলেবর মনোমত ভাবে, বর্দ্ধিত আকারে বাহির করিতে পারিলাম না। বহু কথা বলিবার থাকিল। যদি কখনও দ্বিতীয় সংস্করণ হয় তবে সে বাসনা পূর্ণ হইবে। নিবেদনমিতি—

পোঃ সিরাজগঞ্জ,
কাওলাকোলা।
শ্রাবণ ১৩২২।

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

শ্রীভগবানের কৃপায় পরিবর্দ্ধিত আকারে 'জলচল ও স্পর্শদোষ বিচার' প্রকাশিত হইল। তিন বৎসর হইল ১ম সংস্করণের সমুদয় পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও অর্থাভাবে ২য় সংস্করণ মুদ্রিত করিতে পারি নাই। সম্প্রতি সিরাজগঞ্জস্থ আরবান্ ব্যাঙ্ক হইতে ৮১০ সুদে পাঁচ শত টাকা কর্জ্জ করিয়া পুস্তক প্রকাশে অগ্রসর হইলাম। ২য় সংস্করণে পুস্তকের কলেবর দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করা হইল। মূল্যও সেকারণ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতে বাধ্য হইলাম। এ সংস্করণে ভারতীয় সমুদয় হিন্দু নেতৃবর্গের অভিমত ও সংবাদ পত্রের মন্তব্য প্রকাশিত হইল। ভরসা করি প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকও পাঠকবর্গের তৃপ্তিবিধানে সমর্থ হইবে। যাঁহাদিগের ভাল লাগিবে—তাঁহাদিগকে ইহার বহুল প্রচারে সহায়তা করিতে অনুরোধ করি। মুদ্রণে এবারেও অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া গেল, পাঠকগণ সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া মূল বক্তব্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিবেন—ইহাই অনুরোধ। স্থানাভাবে এবারও বহু কথা রহিয়া গেল, ভগবৎ কৃপায় তৃতীয় সংস্করণ ছাপাইবার প্রয়োজন হইলে বিস্তৃতভাবে বলিবার বাঞ্ছা রহিল। যে সমুদয় হিতৈষী বন্ধুবর্গের পরিশ্রম, যত্ন, চেষ্টা ও সহায়তায় পুস্তক প্রকাশিত হইল তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত দামোদর বি, এ. মহাশয়ের ও শ্রীমান্ দীনবন্ধু আচার্য্যের কঠোর পরিশ্রম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

সিরাজগঞ্জ, বৈশাখ ১৩৩১।

জলচল।

অবতরণিকা।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য প্রাচীন যুগের প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিগণ কতই না হৃদয়-রুধির দান করিয়া গিয়াছেন। মানবজাতির উন্নতি সাধনই তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ভারতের উন্নতি, সমাজের উন্নতি, ভারতীয় হিন্দুগণের নৈতিক আধ্যাত্মিক দৈহিক সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য তাঁহারা প্রাণ পাত করিয়া গিয়াছেন। বিরাটরূপী মানব সমাজের সেবাই তাঁহারা ভগবানের সেবা বলিয়া মনে করিতেন। যেরূপ বিধি-নিয়মে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিবর্ণের সমভাবে কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সেইরূপ বিধি ব্যবস্থা আইন-কানুনই তাঁহারা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এ ব্যবস্থায় একদেশদর্শিতা ছিল না। সমাজবিশেষের নিগ্রহ করিয়া সমাজ-বিশেষের মঙ্গল সাধনে যত্নবান্ থাকিতেন না, হিংসা-দ্বেষ সে পূত হৃদয়ে স্থান পায় নাই। এক ভূমা মহান্ ভগবানের অংশ প্রত্যেক মানবের মধ্যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে, জীবের মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। মানুষকে ঘৃণা করিলে সেই ভূমাকেই ঘৃণা করা হইবে, তাঁহারা ইহা বিলক্ষণ জানিতেন। তাই প্রত্যেক জীবের প্রতি, মানবের প্রতি, তাঁহারা সমান স্নেহ, সমান ভালবাসা পোষণ

করিতেন। কাহাকেও ঘৃণা বা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন না। যেরূপ ভাবে সমাজকে পরিচালিত করিলে, যে নিয়মে বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রচার করিলে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ মনঃ, আত্মার কল্যাণ অনুষ্ঠিত হয়, সেইরূপ বিধি-ব্যবস্থাই প্রণয়ন করিতেন। যাহাতে প্রত্যেক মানবের মানবত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারে, যাহাতে প্রত্যেক মনুষ্যের ব্রহ্মবিকাশের সাহায্য করে, সেইরূপ বিধি-নিয়মই তাঁহারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হায়! কাল-বশে সে বিধি-ব্যবস্থার কি শোচনীয় দশাবিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। আর্য্য-ঋষিগণ স্থির করিয়াছিলেন, আত্মার উন্নতি সাধনই মানবের চরম উন্নতি সাধন। সেই আত্মোন্নতি সাধন করিতে হইলে মনঃ পবিত্র করা প্রথম প্রয়োজন। আবার দেহ শুদ্ধি মানসিক পবিত্রতার হেতু। পবিত্র অশন বসন, বিশুদ্ধ স্থান, নিরাময় সংসর্গ দেহ-শুদ্ধির অনুকূল এবং উহাও আবার আহার্য্য বস্তুর পবিত্রতা, আধার, স্থান, কাল ও পাত্রের উপর নির্ভর করে। ইহার যে কোন বিষয়ে দোষ ঘটিলে খাদ্য দ্রব্য শরীর রক্ষক না হইয়া, মনঃ ও আত্মার কল্যাণ সাধনের সাহায্য না করিয়া বরং সকলের অনিষ্টকারকই হইয়া থাকে। আধারের দোষে, স্থানের দোষে, কালের দোষে পাত্রাপাত্রের দোষে, খাদ্য বস্তু যে দূষিত হয়—তাহা সকলেরই সুবোধ্য। কিন্তু স্পর্শমাত্রই—স্পর্শদোষেই কি প্রকারে খাদ্যে দোষ ঘটে, সেই দোষে কিরূপে মনঃ কলুষিত হয় ও আত্মার অবনতি হয় তাহা তত সহজে বোধগম্য বা ধারণা হয় না। আমরা চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট জাতির স্পৃষ্ট জল বা খাদ্য কিম্বা জল খাদ্য উভয়ই অপর কতকগুলি জাতির অগ্রাহ্য। শৈশবে খেলিতে খেলিতে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যখন উৎপলদের বাড়ীতে জল খাইতে গিয়াছিলাম এবং উৎপলের মা বলিয়াছিল "বাবা আমরা জাতিতে সা, আমাদের হাতে তোমাদের জল খাইতে নাই, যাও বাবা, বাড়ী গিয়ে জল খেয়ে এসো"; যে দিন পাঠশালা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় রাখালদের বাড়ী জল খাইতে গিয়াছিলাম তখন রাখালের মাও বলিয়াছিল,

"বাবা আমরা সূতার, আমাদের হাতে কি তোমরা বামণের ছেলে জল খাইতে পার? আহা বাবা, আমরা ভাগ্যহীন তোমাদের জল দিবার কি আমাদের সাধ্য আছে? আমরা কি অত পুণ্য করিয়াছি? যাও বাড়ী গিয়ে জল খাওগে?" সেই দিন হইতেই ধারণা বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতি সাহা, সূত্রধর প্রভৃতি নীচ (?) জাতির জল গ্রহণ করিতে পারে না। খাদ্য গ্রহণ সম্বন্ধেও বাল্যকাল হইতে আমাদের ধারণা পূর্ব্বরূপই হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এতদিনে কথাটা বুঝিবার জন্য একটা আশা জাগিয়াছে। এক ব্যক্তির স্পর্শে অপরের পক্ষে জল কিরূপে দূষিত হয় পানেব অযোগ্য হয় ইহা একটা রহস্য বলিয়াই বোধ হয়। প্রকৃতির কোন্ মহীয়সী শক্তিব প্রভাবে, ভগবানেব কোন্ অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়ার শক্তিতে, মানব বুদ্ধিব অন্তবালে সৃষ্ট হইয়া যে জল বিধাতার নিদেশে গিরি প্রান্তব বন উপবন নগব পল্লী ভেদ করিয়া কুলুকুলু-নাদে তবঙ্গ-ভঙ্গে বহিয়া বহিয়া অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে প্রাণীমাত্রের প্রাণ বক্ষা কবিতেছে, সেই জীব-মাত্রের জীবন-স্বরূপ জল একটী মানুষের স্পর্শে—অব্যক্ত ব্রহ্ম ভগবানের ব্যক্ত মূর্ত্তি স্বরূপ মানুষের স্পর্শে কিরূপে অপবিত্র অপানীয় হয় তাহা আমাদের অবোধগম্য। যে জলে মানব অপেক্ষা ইতর জন্তু মৎস্য, কচ্ছপ, মকর, কুম্ভীব, হাঙ্গর প্রভৃতি জলজন্তুগণ নিয়ত বাস কবিয়া থাকে, কত প্রকাব বিষাক্ত—বিষধর জন্তু বাস করিয়া থাকে; যে জলে মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গেব মৃত দেহ গলিত পচা দুর্গন্ধময় শবদেহ নিবন্তর ভাসিয়া যাইতেছে, যে জলে কত কলেড়া কত বসন্ত কত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রোগীর ক্লিন্ন শবদেহ পচিয়া পচিয়া খসিয়া যাইতেছে, ক্রীমিকীট কেন কত প্রকার মৎস্যাদি কর্ত্তৃক নিরন্তব ভক্ষিত হইতেছে; যে জলে শিশু সন্তানগণের মল মূত্র প্রতি নিয়ত ধৌত করা হইতেছে, সেই জল পানে—দেব-কার্য্যে ব্যবহারে অপরাধ হয় না, জাত যায় না, আর সাহা সুবর্ণবণিক সূত্রধর নমঃশূদ্র প্রভৃতি স্বধর্ম্মা-

বলম্বী ভ্রাতৃগণের স্পর্শে অপবিত্র হয়, পানের অযোগ্য হয়, জাতি যায়? কি প্রহেলিকা!

যে মৎস্য, পচা মৃত মনুষ্য গো, অশ্ব, গর্দ্দভ প্রভৃতি পশুর মাংস নিয়ত লোক-লোচনের সম্মুখে ভক্ষণ করিতেছে, যে মৎস্য, মানবের অতি ঘৃণিত মল বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতেছে, যে মৎস্য, কফ কাশ ক্রীমি কীট ভক্ষণ করিয়া হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ হইতেছে, সেই মৎস্য আহারে কোন ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতি অপবিত্র অশুচি ও পাতক-গ্রস্ত হইতেছেন না, কাহারও জাত যাইতেছে না, কিন্তু সাহা সুবর্ণবণিকের জল পানে তাঁহারা জাতি যাইবার আশঙ্কা করিতেছেন।

যাঁহারা সকল বিষয়েই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় তৎপর তাঁহাদের মত এইরূপ শুনি যে, ঐ সাহা সুবর্ণ-বণিক নমঃশূদ্র সূত্রধর প্রভৃতি হীন জাতীয় লোক সকলেব দেহ হইতে এক প্রকার বৈদ্যুতিক শক্তি ক্ষরিত হইয়া ঐ জলে প্রবেশ করে এবং ঐ স্পৃষ্ট জল, জল-পানকারীর শরীরের মধ্যে সেই শক্তি আনয়ন করে, সুতরাং স্পর্শদোষে একের ভাব প্রকৃতি চরিত্র অন্যের দেহ প্রবেশ করে। কাজেই উত্তম যদি অধম স্পৃষ্ট জল বা খাদ্য গ্রহণ করে, তবে তাঁহার প্রকৃতি ও চরিত্রেরও অধমত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। সুতরাং সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ নিয়ম করিলেন, উত্তম ব্যক্তি অধমেব জল গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু হায় সেই নিয়মের এখন কি শোচনীয় পরিণতি! আমাদিগের দুর্ভাগ্য, ভারতীয় হিন্দু জাতির দুর্ভাগ্য, যে সে সুব্যবস্থায় কালক্রমে নানা প্রকার গোড়ামী গলদ্ প্রবেশ করিয়া উহাকে অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। বর্ত্তমান সমাজপতিগণের সে সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাই, পাত্রাপাত্র বিচারের ক্ষমতা নাই, দেশ কাল পাত্র ভেদে বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের শক্তি নাই, উত্তম অধম বিচারের সামর্থ্য নাই। বন্দ্যপাদ আর্য্যঋষিগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়া তাহা খাটাইবার দক্ষতা নাই। অন্ধের ন্যায় কেবল পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করিয়া যাইতেছেন মাত্র। বিধি

ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া কেবল আকৃতি লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন, ভিতরকার সার বস্তুটী হারাইয়া বাহ্যিক খোলসখানা লইয়া, নারিকেলের ভিতর ত্যাগ করিয়া বাহিরের ছোবড়া লইয়া টানাটানি মারামারি করিতেছেন; মর্ম্মার্থ ছাড়িয়া দিয়া কেবল মাত্র ভাষাটী শ্লোকগুলি ধরিয়া বসিয়া আছেন। এই জন্যই হিন্দু সমাজের—ভুবন-বরেণ্য হিন্দু-সমাজের আজ এই দুর্দ্দৈব, এই শোচনীয় অধঃপতন, এই অনর্থ সৃষ্টি! দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে সমাজ দেহে গোঁড়ামি-কীট প্রবেশ করিয়া উহাকে অন্তঃসার শূন্য কবিয়া ফেলিয়াছে ও দিন দিন শোচনীয় ভাবে ফেলিতেছে। ভূয়োদর্শী ঋষিগণ গভীর গবেষণা বলে নির্ণয় করিলেন, উত্তম অধমের—সত্ত্বগুণাবলম্বিগণ তমোগুণাবলম্বিগণের স্পৃষ্ট খাদ্য পানীয়াদি গ্রহণ করিবে না। বর্ত্তমান সমাজাচার্য্যগণ ইহা হইতে বুঝিয়া বসিলেন, কতিপয় জাতি অপর কতিপয় জাতির খাদ্য পানীয়াদি গ্রহণ করিতে পারিবে না, করিলে জাত যাইবে, সমাজচ্যুত করা হইবে। তাঁহাদের নিয়ম ছিল ব্যক্তিগত ভাবে ব্যষ্টিকে লইয়া, ইঁহাদের নিয়ম হইল সমষ্টিকে লইয়া জাতির সমগ্রকে লইয়া। তাঁহারা উত্তম অধম নির্ণয় করিতেন, ব্যবহার চরিত্র গুণ ও কার্য্য দ্বারা, ইঁহারা করিলেন জন্ম দ্বারা। তাঁহাদের নিয়মে অধম হইলে ব্রাহ্মণও পরিত্যাজ্য ছিল, ইহাদের নিয়মে উত্তম হইলেও শুধু জন্মের জন্যই শূদ্র পরিত্যাজ্য, নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি জাতির স্পৃষ্ট জল ও খাদ্য পরিত্যাজ্য অগ্রাহ্য। তাঁহারা সংজ্ঞা দ্বারা কার্য্যাকার্য্যের লক্ষণ দ্বারা উত্তম অধম নির্ণয় করিতেন, ইঁহারা ক্ষমতা ও ন্যায় বিচারের অভাবে এবং কষ্ট-লাঘব করিবার জন্য উত্তম অধমের সিল্ দিয়া মার্কা মারিয়া নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। হাজার কুকর্ম্ম করিলেও সেই মার্কা মারা উত্তম অধম বলিয়া পরিগণিত হইবে না এবং হাজার সৎকর্ম্ম করিলেও মার্কা মারা অধম উত্তম হইতে পারিবে না। প্রাচীন ঋষিগণ বিধাতার বিধান রক্ষা করিয়া বিধি ব্যবস্থা

প্রণয়ন করিতেন, সদ্‌গুণ ও ধর্ম্মবলে, ভক্তি ও জ্ঞান-প্রভাবে যিনি যতটা ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইতেন, তাঁহারা তাঁহাকেই তত উচ্চে স্থান দান করিতেন; কিন্তু বর্ত্তমান সমাজপতিগণ বিধাতার উপরেও কলম চালাইতে কুণ্ঠিত হন নাই; দোষ গুণের পাপ পুণ্যের ভাল মন্দের বিচার না করিয়া একেবারে সহজ উপায়ে জন্ম দ্বারা উচ্চ নীচ বংশ দ্বারা উত্তম অধম স্থির করিয়া দিয়াছেন।

ফলতঃ সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ অনুযায়ী মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন হইয়া থাকে। শম দম শৌচ সন্তোষ সম্পন্ন জ্ঞানবান্ দয়ালু সত্যশীল অচ্যুতে নিবিষ্টচিত্ত সংযতচেতা ধ্যান-ধারণামগ্ন জিতেন্দ্রিয় (১) ব্যক্তিগণের সহিত কি হিংসাপরায়ণ মিথ্যাবাদী লোভী সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী শৌচাচার পরিভ্রষ্ট মধু মাংস বিক্রয়ী সর্ব্বভক্ষক (২) মানবের সমতা হইতে পারে? পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বগুণাবলম্বী মানবগণ কি কখন পরবর্ত্তী এতাদৃশ তমোগুণাবলম্বী মানবগণের উপযোগী খাদ্যাদি খাইতে পারেন অথবা তাহাদের স্পৃষ্ট খাদ্য পানীয় আদি কখন গ্রহণ করিতে পারেন? না তাহা পারেন না। উভয় শ্রেণীর রুচি সম্পূর্ণই বিভিন্ন। একের যাহাতে রুচি, অন্যের তাহাতে বিতৃষ্ণা; এক জন ভোগী, অন্য জন নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী, একজন ইহলোক সর্ব্বস্ব, অন্য জন পারলৌকিক মঙ্গল সাধনে ধ্যানমগ্ন। সুতরাং কেমন করিয়া মিলন হইতে পারে? তৎকালের সত্ত্বগুণান্বিত ব্রাহ্মণ তমোগুণান্বিত

---

(১) শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তি রার্জ্জবং।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্ম লক্ষণং।—(শ্রীমদ্ভাগবত)

(২) হিংসানৃত প্রিয়া লুব্ধা সর্ব্ব কর্ম্মোপ জীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ। (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব)
সর্ব্বভক্ষ রতি র্নিত্যং সর্ব্ব কর্ম্ম করোঽশুচিঃ।
ত্যক্ত বেদস্থনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ।—(মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব)

তৎকালীয় শূদ্রের সংস্রব সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিয়া চলিতেন। শূদ্রের মাংস-বহুল খাদ্য ব্রাহ্মণের অমেধ্য তুল্য পরিত্যাজ্য ছিল। শূদ্র আচার হীন নিষ্ঠুর অপবিত্র দেহ বেদবিদ্যা-বিগর্হিত তাহার সহিত কেমন করিয়া আচারবান্ ভগবৎ পদারবিন্দনিমগ্ন-চিত্ত সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি পরম দয়ালু পবিত্র দেহ বেদ-বিদ্যা-মণ্ডিত ব্রাহ্মণের সংস্রব থাকিতে পারে? বিশেষতঃ পূর্ব্বকালে অনেক সময় শূদ্র জাতীয় ব্যাধগণ পানীয়জলে কূপোদকে ও খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে অজ্ঞাত ভাবে বিষাক্ত দ্রব্যাদি মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ পথিকগণের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইত। এই জন্যও তৎকালে এই সব শূদ্রগণের স্পৃষ্ট জল, খাদ্য দ্রব্য এবং স্পৃষ্ট কূপের জল ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতিগণ আইন করিয়া ব্যবহার রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। এরূপকরা তৎকালে সময়ের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয়ই হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহা অস্বাভাবিকও নহে। কিন্তু প্রাচীনকালের সেই নিয়ম এক্ষণে চলিতে পারে না। কেন না তখনকার মত ব্রাহ্মণ এখন নাই এবং তখনকার মত শূদ্রও এখন নাই। ব্রাহ্মণের শোচনীয় পতন হইয়াছে শূদ্রের বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হইয়াছে। একটু পূর্ব্বে শূদ্রের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ের শূদ্রগণ আর সেরূপ লক্ষণ-বিশিষ্ট নহে। তাহারা সর্ব্বাংশে উন্নত হইয়াছে। বিদ্যায় ধনে আচারে ব্যবহারে কার্য্যে তাহাদের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। অথবা বলিতে কি প্রাচীন-কালে শূদ্র বলিতে যাহাদিগকে বুঝাইত বর্ত্তমান সময়ে হাড়ি ডোম মুদ্দাফরাস ব্যাধ ও ন্যাথর প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কোন জাতিকে আর বুঝাইতেছে না। সমাজপতিগণ যাহাদিগকে এখন শূদ্র বলিতেছেন প্রকৃত পক্ষে তাহাদের অধিকাংশই শূদ্র নহে—বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত। কাল ধর্ম্মে বৈদেশিক আক্রমণে বিজাতীয় শাসনে ব্রাহ্মণগণের যেরূপ শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণেরও ঠিক তদ্রূপই হীন দশা ঘটিয়াছে। কালচক্রের দারুণ নিষ্পেষণে ব্রাহ্মণের ন্যায়

বৈশ্য,ক্ষত্রিয়গণেরও অস্থি মজ্জা পিষিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ উপপ্লাবনে বৈদিক আচার ব্যবহার রীতি-নীতি ভাসিয়া গিয়াছিল। যদুবংশের আত্মকলহে ও শেষ কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ভারতের অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণ যাহা ছিল, দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অষ্টাদশ দিনের মহাকাল সমরে চির নিদ্রায় শয়ন করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বেও একবিংশতিবার না হউক, দুরন্ত ব্রাহ্মণ পরশুরামের হস্তে ভারতের বহু ক্ষত্রিয় সন্তান জীবন দান করিয়াছিল এবং প্রাণ ভয়ে অনেকে বৈশ্য শূদ্র সাজিয়া ক্ষত্রিয় বৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক বৈশ্য শূদ্রোচিত বৃত্তি অবলম্বন করতঃ প্রাণ ধারণ করিতেছিল। যে দুই চারি জন ক্ষত্রিয় ছিল তাহারা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীগণের ক্রীড়নক স্বরূপ ছিল। এইরূপ ভাবে যখন ব্রাহ্মণগণের দারুণ অত্যাচারে ও মুষ্টিমেয় ক্ষত্রিয়গণের নিদারুণ অবিচারে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বৈশ্য শূদ্রগণ জর্জ্জরিত হইতেছিল, কুক্কুর বিড়ালের মত তাহাদের উপর ব্রাহ্মণগণের অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তখন অত্যাচার অবিচারের ঘনান্ধকার অপসারিত করিয়া, স্নেহ সহানুভূতির, করুণা ভালবাসার, প্রেম শান্তির বিজয়পতাকা লইয়া পরম প্রেমাবতার শাক্যসিংহ অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার স্নেহবিজড়িত প্রেমের আহ্বানে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী অত্যাচার নিপীড়িত পদ-দলিত ঘৃণিত বৈশ্য শূদ্র আসিয়া সমবেত হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইয়া অত্যাচার দাবদগ্ধ প্রাণ সুশীতল করিল। দেখিতে দেখিতে শুধু ভারতবর্ষ নহে পৃথিবীর বার আনা লোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহাবন্যায় ভারতবর্ষ একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে। কোথায় তাহার যাগযজ্ঞ, কোথায় তাহার বৈদিক আচার বিধি, আর কোথায়ই বা তাহার সাধের জাতিভেদ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম !

পরে শঙ্করাচার্য্য, কুমারিল ভট্ট প্রভৃতির চেষ্টায় কয়েক লক্ষ লোক মাত্র উপবীত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

তথাপি বঙ্গদেশ যেমন তেমনই ছিল। বঙ্গে আর হিন্দু ধর্ম্মের, বৈদিক আচারের কোন চিহ্নই ছিল না। তাই আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই বৌদ্ধ উপপ্লাবনের ফলেই ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ বৈদিক সংস্কার ও উপবীত ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই যাহা জানেন বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের পণ্ডিত মহাশয়গণ তাহা জানেন না, জানিতে চেষ্টাও করেন না। তাঁহাদের ঐ এক ছেলেমানুষের কথা—বৈশ্য ক্ষত্রিয় হইলে উপবীত নাই কেন—বেদ-বিদ্যা নাই কেন? তাহাদের মাসাশৌচ কেন? বিদ্যালয়ের তরলমতি বালকগণ পর্য্যন্ত যাহা বুঝে এই প্রবীণ পণ্ডিতগণ তাহা বুঝিতে পারে না, কি আশ্চর্য্য! দেশের অগণ্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অধিবাসীকে শূদ্ররূপ মনঃকল্পিত আখ্যায় অভিহিত করিয়া, তাহাদিগকে পংক্তি নির্ব্বাসন করিয়া সামাজিক ও আধ্যাত্মিকাদি সর্ব্ব প্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া অস্পৃশ্য অধম করিয়া রাখিয়া সমাজপতিগণ যে আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছেন, তাহা কি হিন্দু জাতির এই মুমূর্ষু দশাতেও তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না? ৯॥০ সাড়ে নয় শত বৎসরে প্রায় ৪০ কোটি হিন্দু লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অনুপাতে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইলে ১০০০ বৎসর পর একটি হিন্দুও হিন্দুনাম রক্ষার জন্য জীবিত থাকিবে না। কেন দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ লোকদিগকে ঘৃণা করি, কি তাদের অপরাধ বুঝিতে পারি না। কুকুর, বিড়াল, ইন্দুর, তেলাপোকা, পশু-পক্ষী যে অধিকার পাইতেছে সে অধিকার কেন আমাদের অগণ্য লোক পাইবে না? মানুষ কি তবে কুকুর বিড়াল অপেক্ষাও হীন নীচ, মানুষ কি তবে কুকুর বিড়াল অপেক্ষা অস্পৃশ্য ঘৃণিত? হায়! হিন্দুসমাজ, এই সব দারুণ অত্যাচার রূপ পাপেই না তোমার আজ এই পরিণাম ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি ত সে ব্রাহ্মণও নাই সে শূদ্রও নাই। শাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণ শূদ্র উভয়েরই বিলোপ ঘটিয়াছে। "সে রামও নাই

সে অযোধ্যাও নাই।" এক্ষণে দেখা যাউক আমরা যাহাদিগকে ভ্রাতৃত্বের স্নেহ বন্ধন হইতে ছিন্ন করিয়া পংক্তি নির্ব্বাসন করিয়াছি, যাহাদের আনীত জল ও স্পৃষ্ট খাদ্য আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ? মল্লিখিত "জাতিভেদ" ও "চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ" পুস্তকে আমি অবিসংবাদীরূপে প্রমাণ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যে বর্ত্তমানে যতই কেন পার্থক্য ঘটুক না কেন মূলতঃ উহারা এক জাতি। ঋষি বংশেই সকলের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র) জন্ম। কর্ম্ম ও গুণানুসারে পরে পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। একই প্রজাপতির আমরা সব সন্তান, বড় ছোট কেহই নাই। আমাদের চারি জাতির মধ্যে জ্ঞাতিত্ব বর্ত্তমান। এক ব্রাহ্মণ জাতিই প্রথমতঃ সৃষ্ট হন, পরে সেই ব্রাহ্মণ হইতেই গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চণ্ডাল প্রভৃতির পরিণতি। আমাদের গোঁড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কিন্তু এ কথা মানিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন—ভগবান্ বিরাট পুরুষের উচ্চ অঙ্গ মুখ হইতে উচ্চ জাতি ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উরু হইতে বৈশ্য ও নিম্নাঙ্গ পাদ হইতে নিম্নজাতি শূদ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এ মত যে নিতান্ত অসার ও ভ্রমাত্মক তাহা আমি পূর্ব্বোল্লিখিত দুইখানি পুস্তকে বিশদ ভাবে প্রমাণ করিয়াছি। কাজেই এস্থানে আর সে বিষয়ে আলোচনা করা সঙ্গত বোধ করিলাম না। আমাদের কর্ণধার অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব প্রণেতা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন—বঙ্গদেশে মাত্র দুই জাতি আছে—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। কাজেই পণ্ডিত মহাশয়গণও একবাক্যে রঘুনন্দনের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন—বঙ্গে গড়ে ৬ জন মাত্র ব্রাহ্মণ আর বাকি ৯৪ জন শূদ্র। অর্থাৎ বৈদ্য, কায়স্থ, বারুই গন্ধবণিক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকার, মোদক, নাপিত, সৎগোপ, তাম্বুলী, তন্তুবায়, তিলি, চাষীকৈবর্ত্ত, গোয়ালা, বৈষ্ণব, যোগী, সরাক, সুবর্ণ-বণিক সেকরা, চাষাধোবা, তাঁতি, সূত্রধর, কৈরী, পুরা, সাহা, ধোপা, জেলিয়া,

কৈবর্ত্ত, কলু, কাপালী, মালো, নমঃশূদ্র, কাছারু, পলিয়া, পোদ, রাজবংশী, শুক্লী, টিপরা, তেওর, ধানুক, বেলদার, চুনারী, কোরা, নাইক, মাঝি, বটী, বাগ্দী, রওয়ান, লাসারি, বহেলিয়া, বাউরী, ভূইয়া, বিন্দ, চাঁই, হাড়ি, মালী, কেওরা, চামার, ডোম, মুচি, তুরী, দোছাদ, কারঙ্গা, সাপুড়ে, খন্দীকার, পাশী, পান, বুনা, বাদিয়া, শিকারী, ম্যাথর, মুদ্দাফবাস প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর সমুদয় জাতিকে রঘুনন্দন শূদ্র সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ২২।২৩টী জাতি আপনাদিগকে কেহ বৈশ্য কেহবা ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিয়া জাতীয় সামাজিক আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তন্মধ্যে বৈদ্য, কায়স্থ, রাজবংশী, নমঃশূদ্রগণের আন্দোলনের মাত্রা সুগভীর—সুভীষণ। বারুই সৎগোপ, তিলি, কৈবর্ত্ত, চাষী-কৈবর্ত্ত ঝালমাল, স্বুবর্ণ বণিক, চাষাধোপা, সাহা, সুত্রধর, কর্ম্মকার নাপিত প্রভৃতি জাতির আন্দোলন ইহার নিম্নে। এই আন্দোলনের ফল যাহা হইবে—তাহা বিচক্ষণগণ দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন। নমঃশূদ্রগণই হিন্দুর মধ্যে চাষী প্রধান জাতি। তাহারা একযোগে দলবদ্ধ হইয়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে—বর্গাজমি চষিতে প্রস্তুত কিন্তু ক্ষেত্র হইতে বাটীতে বোঝা বা শস্যাদি দিতে অসম্মত! জোতদার হিন্দুগণের সমূহ বিপদ উপস্থিত! ওদিকে মুসলমান বর্গাদারগণও বাটীতে শস্য আনিয়া দিতে অসম্মত। মালী অনেক জাতির কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, নৌকার মাঝি পোঁটলা-পুটলী বহন করিয়া বাড়ী হইতে ঘাট পর্য্যন্ত আনিতে—স্ত্রীলোক লইতে, অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে। মজুর একরূপ মেলে না। যাহা মেলে তাহা দৈনিক ।০, ।৵০, কি ৷৹০ আনা পর্য্যন্ত। তাও বহু সাধ্য সাধনা করিয়া আনিতে হয়। লক্ষ লক্ষ বৎসরের অত্যাচারিত প্রাণ এইবার জলিয়া উঠিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা—অবাধবিদ্যা, স্কুল কলেজ অত্যাচারের মূলোৎপাটনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বাদসাগণ অস্ত্র-বলে যাহা করিতে পারেন নাই, ইংরাজী আমলে, অবাধবিদ্যা প্রচারে তাহা সম্পন্ন হইতে

চলিয়াছে। মানবের অধিকার কি এবং তাহা কেমন করিয়া হস্তগত করিতে হয় অবজ্ঞাত শ্রেণীর অগণ্য লোক-সমূহ তাহা এক্ষণে বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়াছে এবং জ্ঞাত হইয়া তল্লাভে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বেদ পাঠে জিহ্বাচ্ছেদ, বেদ শ্রবণে কর্ণরন্ধ্রে তপ্ততৈল নিক্ষেপ, ভগবৎ আবাধনায় শিরশ্ছেদ প্রভৃতি শূদ্রযোগ্য ন্যায় ও দয়ালদণ্ডের এইবাব প্রায়শ্চিত্ত আবস্তু। চারি যুগের দারুণ অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত এক সঙ্গে উপস্থিত। অভিজাতগণ, এইবার সাবধান ও সতর্ক হউন!

এক্ষণে দেখা যাউক পূর্ব্বোক্ত সামাজিক আন্দোলনকারিগণের প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রসম্মত কোন দাবী আছে কি না। তাহারা কি বিধিসঙ্গত আন্দোলন করিতেছে, না—অম্‌নি শুধু শুধুই একটা মিথ্যা কল্পনা জল্পনা লইয়া আন্দোলনে তৎপর হইয়াছে। আমি যতটা জানি, তাহাতে আমার বিশ্বাস, আন্দোলনকারী-গণের প্রকাশিত ও লিখিত পুস্তকাদি কোনরূপ যুক্তিযুক্ত শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করা হইতেছে না, কেবল মুখে মুখে সভাসমিতি করিয়া বলা হই-তেছে, 'তোমরা যাহা আছ তাহাই থাক, তোমাদিগকে কোনপ্রকার উচ্চ অধিকার দেওয়া হইবে না।' এই বিংশ শতাব্দীতে এ প্রকার উত্তরে শিশুকেই নিবৃত্ত করা যায় না তা আবার ইংরাজী শিক্ষা-প্রাপ্ত বিপুল উদ্যমশীল যুবকগণকে কি কখন নিবৃত্ত করা যাইতে পারে? কখনই নয়। ভারত এখন আর শুধু ব্রাহ্মণের ভাবত নাই। ভারত এখন আচণ্ডালের ভারত। সারা ভারতময় হিন্দু সমাজের একচেটিয়া অধিকার ব্রাহ্মণগণকে এখন উঠাইয়া লইতে হইবে। ২০ কোটি হিন্দু লইয়া হিন্দুসমাজ, না মুষ্টিমেয় তর্ক-চূড়ামণি, তর্করত্ন, তর্কবাগীশ লইয়া হিন্দুসমাজ? ভারতীয় হিন্দুসমাজ এখন আর তর্কবাগীশের নয়—এখন উহা ন্যায়বাগীশের। তর্কের যুগ গিয়াছে, তর্ক করিয়া অধিকার লাভের যুগ অতীত হইয়াছে। এখন ন্যায়ের যুগ—যুক্তির যুগ। এ যুগ শাস্ত্রের ভ্রুকুটীতে, পারলৌকিক দোহাইএ অভিশম্পাতের ভয়ে, টিকির

আন্দোলনীতে ভীত হইবার নহে। সে বর্ব্বর যুগ কালের কুক্ষিতে চিরতরে বিলীন হইয়াছে।

শূদ্রের লক্ষণ।

অন্যান্য সমুদয় জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত কতিপয় উচ্চ শ্রেণীর জলচল জাতির জাতিতত্ত্ব ও বর্ণতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। নতুবা প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র আলোচনা করা এতাদৃশ ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভবপর নহে, প্রয়োজনও নাই। আমাদের উপস্থিত আলোচ্য জাতি হইতেছে বৈদ্য, কায়স্থ, বারুজীবি, সদ্গোপ, গন্ধবণিক, তিলি, তাম্বুলি, কর্ম্মকার, মালাকার, তন্তুবায়, নাপিত, মোদক প্রভৃতি। ইহারা সকলেই উচ্চশ্রেণীস্থ এবং সর্ব্ববাদী-সম্মতরূপে জলাচরণীয় জাতি। রঘুনন্দন এবং তৎপ্রদর্শিত পণ্ডিতগণ বলিতেছেন—ইহারা সকলেই শূদ্র। এক্ষণে দেখা যাউক ইহারা প্রকৃত পক্ষেই শূদ্র কি না। শাস্ত্রকারগণ শূদ্রের এইরূপ লক্ষণ ও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

হিংসানৃত প্রিয়া লুব্ধা সর্ব্বকর্ম্মোপ জীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ-পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

(মহাভারত ; শান্তিপর্ব্ব, ভৃগু ভরদ্বাজ সংবাদ।)

"যাঁহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসাপরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্ব কর্ম্মোপজীবী, কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট, মিথ্যাবাদী ও শৌচ ভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়া ছিলেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

লাক্ষা লবণ সম্মিশ্র কুসুম্ভক্ষীর সর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধু মাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥ ৩৭০

(অত্রি সংহিতা)

যে লাক্ষা লবণ, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু মাংস বিক্রয় করে সেই ব্রাহ্মণ নামধেয় আর্য্য শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অপিচ—

সর্ব্ব ভক্ষ রতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্ম করোঽশুচিঃ।

ত্যক্তবেদস্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥

যিনি অপবিত্র অশুচি, যাঁহার খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, সর্ব্ব-ভক্ষক, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, জীবিকা নির্ব্বাহের, ব্যবসায়ের বা বৃত্তির স্থিরতা নাই, বেদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং আচার ভ্রষ্ট হইয়াছেন তাঁহাকে শূদ্র বলা যায়।

পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

শূদ্র তমোগুণ প্রধান, অলস, নিরুৎসাহ এবং জ্ঞানহীন সুতরাং দাসত্বই তাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

শূদ্র চিনিবার আর একটি প্রধান চিহ্ন ছিল—শরীরের রং। ব্রাহ্মণের শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ, বৈশ্যের পীতবর্ণ এবং শূদ্রগণের

"শূদ্রাণামাসিতস্তথা,,

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৮৭ অধ্যায়।)

শরীরের সাধারণ রং ছিল কৃষ্ণবর্ণ। অর্থাৎ আফ্রিকার নিগ্রো-গণকে দেখিবা-মাত্র যেমন তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা চিনিতে পারা যায় পূর্ব্বে শূদ্র দাসগণকেও শুধু শরীরের বর্ণ বা রং দ্বারাই চিনিতে পারা যাইত যে ইহারা শূদ্র।

মৎকথিত জলাচরণীয় নবশায়কগণ কিন্তু প্রথম শ্লোকের নোটেই অন্তর্ভুক্ত নহে। দ্বিতীয় শ্লোকে যে দুগ্ধ ও ঘৃত বিক্রয়ের কথা আছে উহাতে আংশিক ভাবে সৎগোপ দোষী বটে কিন্তু বৈশ্যের লক্ষণেইত আছে।

"কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্য কর্ম্ম স্বভাবজম্"

কৃষি গোপালন গোরক্ষা প্রভৃতি বৈশ্যের জীবিকোপজীবী বৃত্তি, কথিত আছে—দ্বাপরে ব্রজগোপিনীগণ পর্য্যন্ত মথুরার বাজারে দধি দুগ্ধ ঘৃত মাখনাদি বিক্রয় করিতে যাইতেন। সুতরাং সৎগোপের পক্ষে দুগ্ধ ঘৃত

বিক্রয় অপরাধের মধ্যে, গণ্য হইতে পারে না। গোরক্ষা গোপালন কার্য্য যদি বৈশ্যের হয়, তবে ঘৃত দধি দুগ্ধ বিক্রয় বৈশ্য না করিলে অন্য তিন জাতি কোথায় পাইবে।

তৃতীয় শ্লোকে—"ত্যক্ত বেদ" ভিন্ন অন্য কোন লক্ষণের সঙ্গে ইহাদের সামঞ্জস্য নাই। "ত্যক্ত বেদ" ইহাই যদি শূদ্রত্বের কারণ হয় তবে ব্রাহ্মণগণও এ শূদ্রত্ব হইতে নিস্তার পান না। কেন না বেদ পাঠ করা ত দূরের কথা কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বাটীতে বেদ আছে কিনা সন্দেহ,—বেদ যে কি পদার্থ তাহা অনেক দেখেনই নাই—পাঠ ত দূরের কথা। "এখনও তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি"। বেদ বেদান্তের বড় বড় কথা কেবল আমরা মুখে আওড়াইতেছি ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলিয়া উচ্চ চীৎকার করিয়া আসর রাখিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছি মাত্র। সুতরাং "ত্যক্ত বেদ" বলিয়া ইহাদিগকেই শুধু দোষী করা যাইতে পারিতেছে না। আর পূর্ব্বেও ত বলিয়াছি—দারুণ বৌদ্ধ বিপ্লব দেশ হইতে বেদের শিক্ষা বেদ-চর্চ্চা বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থায় এই সব জাতি বেদ পাইবে কিরূপে? বিশেষতঃ তাহার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেও বেদ ব্রাহ্মণগণের এক চেটিয়া সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বংশপরম্পরারূপে ব্রাহ্মণ-গণ শুধু ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকেই বেদ-বিদ্যা দান করিতেন। ক্ষত্রিয়-রাজপুত্রগণ যেরূপ বংশপরম্পরারূপে পিতৃ-সিংহাসন পিতৃ-সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন—ঐ সিংহাসন বা রাজৈশ্বর্য্যে এবং বৈশ্যের ঐ ধন সম্পত্তিতে যেমন সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ-শূদ্রকে বঞ্চিত করা হইয়াছিল কাজেই বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের একমাত্র সম্পত্তি বেদ-বিদ্যা ও অধ্যাত্ম-বিদ্যা হইতে অপর তিন জাতিকে বঞ্চিত করিতে বাধ্য হইলেন এবং উহাকে তাঁহারা আপনাপন জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় ও উপযোগী করিয়া তুলিলেন। এই সময় হইতেই বেদমন্ত্র ও পূজার্চ্চনায় 'দক্ষিণা-বাক্যের' সূচনা আরম্ভ হইল। তাই বলিতেছিলাম এই

"ত্যক্ত বেদ" অপরাধেই তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। চতুর্থ শ্লোক অনুযায়ী দাসত্ব তাহাদের বৃত্তি বলা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক—একশত বৎসর পূর্ব্বে উল্লিখিত কায়স্থ নরসুন্দর মালী তন্তুবায় নমঃশূদ্র প্রভৃতি ভিন্ন প্রায়শঃ অন্য কোন বর্ণ অন্য বর্ণের (ব্রাহ্মণের পর্য্যন্ত) দাসত্ব করিত না। ইহাদিগের মধ্যে—ব্যক্তিগত হিসাবে অনেকে দারিদ্র্য বশতঃই দাসত্ব করিত, সমষ্টি হিসাবে নহে। কেন না—ঐ সমস্ত জাতির ব্যবসায়ে যথেষ্ট পয়সা রোজগার হইত। দাসত্ব করিতে যাইবে তাহারা কোন্ দুঃখে? বর্ত্তমান কালের ন্যায় দাসত্বের নামান্তর চাকুরীর প্রতি তখনকার, শতবৎসর পূর্ব্বের লোকের এতাদৃশ অনুরাগ ছিল না। সুতরাং "পরিচর্য্যা করা" অপরাধ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত মনে করিতে হইবে। ৫ম বা শেষ শ্লোকে যে "কৃষ্ণ বর্ণ" শূদ্রের শরীরের রং এর কথা বলা হইয়াছে সে অপরাধেও তাহাদিগকে অপরাধী করা যাইতে পারে না। কেন না ইহাদের সন্তানগণের মধ্যে অনেক পূর্ণচন্দ্রানন—ইন্দিবরাক্ষ পক্কবিম্বাধর দেখিতে পাওয়া যায়—অন্য পক্ষে অনেক ব্রাহ্মণের গৃহে অমাবস্যা পরাজিত—আবলুস বিনিন্দিত নধরকান্তি শিশুর অভাব নাই। সুতরাং শাস্ত্রের লক্ষণ দ্বারা বিচার করিয়া দেখা গেল, ইহারা শূদ্র লক্ষণাক্রান্ত নহে; তাহাপেক্ষা বহুলাংশে উন্নত সুতরাং বৈশ্য ক্ষত্রিয় সংজ্ঞাভুক্ত বলা যাইতে পারে। এই পাঁচ শ্লোকের প্রমাণও যাঁহারা যথেষ্ট মনে করেন না তাঁহাদিগের জন্য আরও প্রদর্শন করা যাইতেছে। স্থিরচিত্তে পাঠ করুন।

(১) শাস্ত্রে আছে—"ন চ সংস্কার মর্হতি—"

শূদ্রের কোন সংস্কার নাই। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির যেমন (ক) বিবাহ (খ) গর্ভাধান (গ) পুংসবন (ঘ) সীমন্তোন্নয়ন (ঙ) জাতকর্ম্ম (চ) নামকরণ (ছ) অন্নপ্রাশন (জ) চূড়াকরণ (ঝ) উপনয়ন (ঞ) সমাবর্ত্তন এই দশবিধ সংস্কার আছে, শূদ্রের সেরূপ কিছু নাই। কিন্তু আমাদের কথিত নবশায়কগণের

মধ্যে এক (ঝ) উপনয়ন-সংস্কার ভিন্ন আর সবগুলিই ব্রাহ্মণের স্থায় আছে। সুতরাং ইহারা শূদ্র নহে।

(২) শূদ্রের "অমন্ত্র যজ্ঞো" মন্ত্রবিহীন যজ্ঞ। কিন্তু নবশায়কগণের পূজাদিতে পুরোহিতগণ কর্তৃক মন্ত্রযুক্ত যজ্ঞই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(২ক) চতুর্থস্য তু বর্ণস্য প্রায়শ্চিত্তং ন বৈ ভবেৎ
ব্রতং নাস্তি তপোনাস্তি হোম নৈব চ বিদ্যতে॥ ৩
পঞ্চগব্যং ন দাতব্যং তস্য মন্ত্র বিবর্জ্জনাৎ।
খ্যাপয়িত্বা দ্বিজানান্ত শূদ্রো দানেন শুধ্যতি॥ ৪
(৫ম অধ্যায়, আপস্তম্ব সংহিতা)

"চতুর্থ বর্ণ শূদ্রজাতির—প্রায়শ্চিত্ত নাই, ব্রত নাই, তপস্যা নাই, হোমও কর্ত্তব্য নহে, পঞ্চগব্য বিধি দিবে না, যেহেতু শূদ্রের মন্ত্রপাঠ বিধি নাই—শূদ্র দান দ্বারা শুদ্ধ হইবে।"

(২খ) অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণঃশূদ্রজাতিষু।
অহোরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধতি॥ ২৪৮। *
(অত্রি সংহিতা।)

"ব্রাহ্মণ অজ্ঞানপূর্ব্বক শূদ্রস্পৃষ্ট জল পান করিলে স্নানান্তে পঞ্চগব্য পান পূর্ব্বক এক দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবেন।" কিন্তু উপরি উক্ত জাতিগণের জল সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে ব্রাহ্মণগণের পানীয়, গ্রাহ্য ও আচরণীয়।

(৩) উদ্বাহতত্ত্বে দেখা যায়—শূদ্রের কোন গোত্র নাই। কিন্তু এই সমস্ত জাতিগণের মধ্যে যথাবিধি গোত্র প্রচলিত আছে।

(৪) মনুসংহিতায় চতুর্থ অধ্যায়ে আছে—
ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥ ৮০

"শূদ্রকে লৌকিক বিষয়ে কোন উপদেশ দিবে না * * * * কোন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে না কিংবা কোনরূপ ব্রত করিতে আদেশ দিবে না।"

কিন্তু ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকে বহুকাল হইতে লৌকিক ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান ও ব্রতাদি পালনের আদেশ দিয়া এবং নিজেরা সেই ব্রত সম্পন্ন করিয়া দক্ষিণাদি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

(৫) জপস্তপস্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনম্।
দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্র পতনানি ষট্॥১৩৫ অত্রি সংহিতা।

"জপ, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন, দেবতা-আবাধন এই ছয়টী কার্য্য স্ত্রীশূদ্রের পাতিত্বজনক।"

তপস্যা ব্রাহ্মণেই করেন না, তা আবার অন্যে করিবে। বাকি পাঁচটী, ব্রাহ্মণের ন্যায় নবশায়কগণও করিয়া থাকেন। বিবেকানন্দ স্বামী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

(৬) "ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ" কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিলক্ষণ পাপ-পুণ্য বোধ আছে এবং সামাজিক কোন পাপ করা মাত্র পণ্ডিতগণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ পতিত।

(৭) কোন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ শূদ্র-যাজন করিবেন না। যিনি শূদ্র-যাজন করিবেন, তিনি মহর্ষি তুল্য হইলেও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট ঘৃণ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয়। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে বহু জাতির যাজককে, শূদ্রজাতিব যাজককে অপাঙ্‌ক্তেয় অর্থাৎ পতিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

যথা—

হিংস্রো বৃষলবৃত্তিশ্চ গণণাঞ্চৈব যাজকাঃ॥ ১৬৪

* * * *

যাবতঃ সংস্পৃশেদঙ্গৈর্ব্রাহ্মণান্ শূদ্রযাজকঃ।
তাবতাং ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দানস্য পৌর্ত্তিকম্॥ ১৭৮

"* * * যে ব্রাহ্মণ নানা জাতীয় লোকের যাজক, যিনি শূদ্র যাজক

ব্রাহ্মণ, ইঁহারা যে যে পংক্তিতে উপবেশন করেন সেই সেই পঙ্‌ক্তিগত শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হইতে দাতা বঞ্চিত থাকেন।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এক জাতীয় শূদ্রের অতিরিক্ত শূদ্র-যাজী ব্রাহ্মণগণ, গ্রাম-যাজীগণ মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যথা—

শূদ্রাতিরিক্তযাজী যে গ্রাম-যাজী য কীর্ত্তিতঃ।

* * * * ॥২০২

এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভীপাকং প্রয়াস্তিতে ॥ ২০৪

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণম্—৩০ অধ্যায়ঃ)

নিম্নে ছয় প্রকার অব্রাহ্মণের কথা বলা হইতেছে—

অব্রাহ্মণাস্তু ষট্ প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববেদিনা।

* * * *

তৃতীয়ো বহুযাজ্যঃ স্যাৎ চতুর্থো গ্রাম-যাজকঃ।

(ইতি শাতাতপঃ—শব্দকল্পদ্রুমঃ।)

গ্রামস্থ নানা বর্ণানাং পুরোহিতঃ। সতু চতুর্থো ব্রাহ্মণঃ।

গ্রামযাজী ব্রাহ্মণ মহাপাপী এবং শূদ্রবৎ—

অসিজীবি মসিজীবি দেবল গ্রামযাজকাঃ।
পাচক ধীবকশ্চৈব ষডেতে শূদ্রবৎ দ্বিজাঃ ॥

এই স্থলে গ্রামযাজী ব্রাহ্মণগণের একটু বর্ণনা প্রদানের লোভ সামলাইতে পারিলাম না। ইহার লেখক কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রণেতা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়। প্রায় ৩৮৫ বৎসর পূর্ব্বের লোক—

'মূর্খবিপ্র ব'সে পুরে, নগরে যাজন করে,
শিখায় পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে, দেব পূজা ঘরে ঘরে,
চা'লের বোচকা বান্ধি টান ॥

ময়রা ঘরে পায় খণ্ড, গোপ ঘরে দধিভাণ্ড,
তেলি ঘরে তৈলকুপি ভরি।
কোথায় মাসড়া কড়ি, কেহ দেয় ডাল বড়ি,
গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতারি॥
গুজরাট নগরে, নাগরিয়া শ্রাদ্ধ করে,
গ্রামযাজী করে অধিষ্ঠান।
সঙ্গে করি দ্বিজ কয়, কাহণ দক্ষিণা হয়,
হাতে কুশা দক্ষিণা স্ফুরণ॥

যদি এই নবশায়কেরা শূদ্র হয়, তবে ইঁহাদের যাজক ব্রাহ্মণগণকেও পতিত ও শূদ্রবৎ হীন হইতে হয়। কিন্তু ইঁহারা ত সমাজে পতিত নহেন। ব্রাহ্মণ সমাজে ইঁহারা হীন হইলেও ইঁহাদের কন্যাগণকে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বিবাহার্থ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন—আর আহারাদি সম্বন্ধে ত কথাই নাই। এই সব পতিত ব্রাহ্মণগণের যাজক-পুরোহিত কিন্তু উচ্চ ব্রাহ্মণগণ। ইঁহারা শূদ্র-যাজনের জন্য পতিত হইলে সে পাপে ও সংস্রব-দোষে সারা ব্রাহ্মণ জাতিই পতিত হইয়াছেন বলিতে হইবে।

শূদ্রগুরু ব্রাহ্মণ পতিত।

(৮) ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্র শিষ্য করা শূদ্রযাজনের মতই পাতিত্যজনক।

যথা—"শূদ্র শিষ্যো গুরুশ্চৈব * * * *॥ ১৫৬

ঐ তৃতীয় অধ্যায় মনু।

"যিনি শূদ্র-শিষ্য—যিনি শূদ্রকে অধ্যয়ন করান— * * * * * * তাঁহাদিগকে হব্যকব্যে ভোজন করাইবে না। কেন না ইঁহারা পতিত ব্রাহ্মণ।"

ইঁহারা যদি শূদ্র হয় এবং ইঁহাদের মন্ত্রদাতা গুরুগণ যদি পতিত হন, তবে বঙ্গের প্রায় সমুদয় ব্রাহ্মণই পতিত হইয়াছেন—যাঁহাদের এ সব জাতি শিষ্য নাই তাঁহারাও শূদ্র-শিষ্য পতিত ব্রাহ্মণগণের সহিত আহারাদি করার দরুণ ও

যৌন সম্বন্ধে নিশ্চয় পতিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের আপনাদের শুধু ব্রাহ্মণ নাম বজায় রাখিতে হইলেও ইহাদিগকে শূদ্রেতর বৈশ্য ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে। তাহা না হইলে তাঁহাদের নিজেদেরই জাত থাকে না।

নবশায়কগণ শূদ্র নহে।

উপরি উদ্ধৃত প্রমাণ দ্বারা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিলাম যে, নবশায়কগণ শূদ্র নহে—শূদ্র হইলে বা তাহাদিগকে শূদ্র বলিলে ব্রাহ্মণের আর ব্রাহ্মণত্ব থাকে না। অন্ততঃ ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখিতে হইলেও তাহাদিগকে বৈশ্য ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে। আর ইহারা যে বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে কিন্তু এ পুস্তকে তাহা উল্লেখ করা অনাবশ্যক। পুস্তকান্তরেই আমি তাহা বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছি। ইহাদিগকে দ্বিজবর্ণান্তর্গত বৈশ্য, ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে গণ্য করিবার 'ও প্রমাণ করিবার কারণ এই যে—তাহা হইলে ইহাদের অন্ন গ্রহণ যোগ্য ইহাই সিদ্ধান্ত হইতে পারিবে; কেন না ব্রাহ্মণগণ বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ের অন্ন গ্রহণ করিতেন, শাস্ত্র পাঠে ইহা অবগত হইতেছি। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণ যে বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের অন্ন গ্রহণ করিতেন তাহাই প্রমাণ করিয়া অতঃপর প্রমাণ করিব যে তাঁহারা শূদ্রের অন্নও গ্রহণ করিতেন। পরাশর স্মৃতি কলিকালের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা :—

কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতম স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতঃ কলৌ পরাশরস্মৃতঃ॥ ২৩

পরাশর সংহিতা—১ম অঃ।

উক্ত শাস্ত্রে লিখিত আছে—

ক্ষত্রিয়বাপি বৈশ্যোবা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ।
তদ্‌গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যশঃ॥

"যে সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রিয়াবান্ এবং শুচিব্রতধারী তাঁহাদের গৃহে ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা "হব্য কব্যে" ভোজন করিবে।

মনু আপস্তম্ব গৌতম প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের মতামত উদ্ধৃত করিয়া বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এম্, এ, পি, এইচ, ডি ; সি, আই, ই ; মহোদয় তাঁহার সুবিখ্যাত "ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস" নামক ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকে আহারাদি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"But in the olden times we see from the Mahabharat and other works, that Brahmans, Kshatriyas and Vaisyas could eat the food cooked by each other. Manu lays down generally that a twice born should not eat the food cooked by a Sudra (IV. 223) ; but he allows that prepared by a Sudra, who has attached himself to one, or is one's barber, milkman, slave, family friend, and co-sharer in the profits of agriculture, to be partaken (IV. 253). The implication that lies here is that the three higher castes could dine with each other. Gautama, the author of a Dharmasutra, permits a Brahman's dining with a twice-born (Kshatriya or Vaisya) who observes his religious duties (17. 1) Apastamba, another wtiter of the class, having laid down that a Brahman should not eat with a Kshatriya and others, says that according to some, he may do so with men of all the *varnas* who observe their proper religious duties, except with the Sudras. But even here there is a counter exception, and as allowed by Manu, a Brahman may dine with a Sudra who may have attached himself to him with a holy intent.

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত এলফিনষ্টোন সাহেবও তৎকৃত "ভারত ইতিহাসের" ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

But there is no prohibition in the code against eating with other classes or partaking of food cooked by them (which is now the great occasion for loss of caste), except in the case of Sudras; and even then the offence is expiated by living on water gruel for seven days. (Manu Ch XI. 153)

পুনর্ব্বার শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর মহাশয় মাদ্রাজে হিন্দুসমাজ সংস্কার সমিতির অধিবেশনে বলিয়াছিলেন—

Even in the time of the epics the Brahmans dined with the Kshatryas and Vaisyas as we see from the Brahmanic—sage Durvasa having shared the hospitality of Draupadi, the wife of Pandavas"

প্রাচীন আর্য্য সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং শেষে কখন কখন শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের ভিতর আহারাদি চলিত। তৎকালে ক্ষত্রিয় রাজগণ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং ব্রাহ্মণগণও সেই সকল নিমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্ব্বক যজ্ঞকালে উপনীত হইয়া আনন্দের সহিত ভোজন করিতেন। মহাভারত পাঠে জানিতে পারা যায় যে পাণ্ডবদিগের বনবাস কালে স্বয়ং দ্রৌপদী রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে মুনি-ঋষিগণকে ভোজন করাইতেন। পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন—প্রাচীন কালে বৈশ্যই সূপকার বা পাচক ছিল। বর্ত্তমান কালের মত ব্রাহ্মণের তখন পাক করিয়া দিয়া বেতন লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত না। তাঁহাদের এমন শোচনীয় পতন তখন হইয়াছিল না। বিরাট-রাজভবনে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন আপনাকে সূপকার বলিয়া পরিচয় দান পূর্ব্বক উক্ত কার্য্যে (রন্ধনের কার্য্যে) নিযুক্ত হইয়া অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত করেন। রাজবাটীতে মুনিঋষি যাঁহারা

অতিথিধর্ম্মী হইয়া আসিতেন সকলেই ঐ সুপকারের অন্নই গ্রহণ করিতেন। তাহাতে তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্য লোপ হইত না। এবং নিজেরাও কখন পাক করিয়া খাইয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অতঃপর তথা কথিত রঘুনন্দনবর্ণিত শূদ্রগণের অন্ন গ্রহণ সম্বন্ধে শাস্ত্র-কারগণ কি বলিয়াছেন আলোচনা করা যাউক। সর্ব্ব প্রথম মনুর কথাই ধরা যাউক। মনু লিখিয়াছেন—

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ দাস গোপালো নাপিতাঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥২৫৩
(মনু-সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়।)

ভূমি-কর্ষক (অর্দ্ধসীরী, বর্গাদার অর্থাৎ যাহার সহিত আধা আধি ভাগ লইয়া এক খণ্ড জমিতে চাষ করা যায়), কুলমিত্র (অর্থাৎ যাহাদিগের সহিত পুরুষানুক্রমে বিশেষ মিত্রতা চলিয়া আসিতেছে) গোপালক (রাখাল), ভৃত্য (চাকর), ক্ষৌরকার (নাপিত), এবং যে "আমি আপনার সেবা করিয়া নিকটে অবস্থান করিব" এরূপ আত্ম নিবেদন করে, এমত শূদ্রের অন্নও ভোজন করা যায়। ভগবান বিষ্ণু বলিয়াছেন :—

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ দাসগোপালনাপিতাঃ।
এতে শূদ্রেষুভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ। ১৬
(বিষ্ণুসংহিতা, ৫৭ অধ্যায়।)

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

শূদ্রেষু দাস গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্না নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥১৬৮
(যাজ্ঞবল্ক-সংহিতা,—১ম অধ্যায়।)

যম বলেন :—

দাস-নাপিত-গোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥২০
(যম-সংহিতা,—১ম অধ্যায়।)

মহর্ষি বেদব্যাস বলিতেছেন :—

নাপিতান্বয় মিত্রার্দ্ধসীরিণো দাস-গোপকাঃ।
শূদ্রাণামপ্যমীষাস্তু ভুক্তান্নং নৈব দুষ্যতি ॥৫১
(ব্যাস-সংহিতা,—১১শ অধ্যায়।)

* * * ইহাদের অন্ন ভোজন করিলে দোষ হয় না।

তদীয় পিতৃদেব পরাশর ঋষিও বলিতেছেন :—

দাস নাপিত গোপাল কুল মিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানঃ নিবেদয়েৎ ॥ ১০
(পরাশর সংহিতা,—১১শ অধ্যায়।)

উপরে মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, যম, ব্যাস, পরাশর সংহিতা হইতে উপরি-উক্ত জাতিগুলির অন্ন-গ্রহণ বিধি ও তাহার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করা হইল। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং তদীয় সংহিতায় আদেশ করিয়াছেন ও ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ৫ জন শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র প্রণেতা ঋষি অনুমোদন করিতেছেন। এখন ভগবানের আদেশ ও পরাশর, ব্যাস, মনুর অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে? আধুনিক কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কি ভগবান বিষ্ণু ও পরাশর ব্যাস যাজ্ঞবল্ক্য অপেক্ষাও অধিক শাস্ত্রজ্ঞ নাকি? কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ পণ্ডিত মহাশয়গণ নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। তাঁহারাও হিন্দু-শাস্ত্রের পাতা উল্‌টাইতে ২ শ্লোকের পর শ্লোক ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে "আদি পুরাণ হইতে পরাশর ভাষ্যধৃত" বাহির করিয়া দেখিলেন এক শ্লোক! আর চাই কি? আনন্দে আটখানা!

সে ভাষ্যটি এইরূপ :—

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং, দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ দত্তাকন্যা প্রদীয়তে। কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।

দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাস গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্।
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য এতানি লোক গুপ্ত্যর্থং
কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ॥"

অর্থাৎ কলি প্রারম্ভের পর, মহাত্মা পণ্ডিতগণ পূর্ব্ব প্রচলিত এই সকল কর্ম্ম সমাজ রক্ষার্থে ব্যবস্থা পূর্ব্বক নিষেধ করিয়া গিয়াছেন—যথা দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, পরিণীতা নারীর পত্যন্তর গ্রহণ, অসবর্ণা কন্যার সহিত দ্বিজাতিগণের বিবাহ, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন ক্ষেত্রজ প্রভৃতিকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ এবং গৃহস্থের দাস (ভৃত্য), গোপালক (রাখাল), কুলমিত্র এবং অর্দ্ধসীরী (বর্গাদার) শূদ্র জাতির মধ্যে ইহাদের অন্ন ভোজন ইত্যাদি।

এখন এই আদি পুরাণের বচন হইতে অনেকগুলি প্রশ্ন উদয় হইতেছে। প্রথমতঃ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে :—

কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতঃ কলৌ পরাশর স্মৃতঃ॥২৩
(১ম অধ্যায়, পরাশর সংহিতা।)

"সত্যযুগে মনু ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে গৌতম ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, দ্বাপর যুগে শঙ্খ লিখিত ধর্ম্ম, কলিযুগে পরাশর নিরূপিত ধর্ম্ম।" ইহা যদি সত্য হয় অর্থাৎ কলিযুগের ধর্ম্ম যদি পরাশর মতানুযায়ীই হয় তবে মহাত্মা বুধগণ (পণ্ডিতগণ) কেমন করিয়া কলির প্রারম্ভেই পরাশরের আইন উল্টাইয়া দিয়া নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিতে পারেন? সমগ্র কলিযুগের জন্য ব্যবস্থা হইল পরাশরের ধর্ম্ম ও বিধি। সেই পরাশরের বিধি অনুসারে কাজ না করিয়াই পণ্ডিতগণ কলির প্রথমেই নূতন হাতগড়া আইন জারি

করিতে পারেন কিরূপ? বরং এরূপ লিখিলে কতকটা সম্ভবপর হইত যে পরাশরের বিধি কলির সিকিকাল কি অর্দ্ধেককাল গত হওয়ার পর। পণ্ডিতগণ দেখিলেন ঐ বিধি সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর হইয়া উঠিল, তখন ঋষিগণ বা মহাত্মাগণ নূতন বিধি রচনা করিয়া পরাশরের বিধি উল্‌টাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নতুবা ঋষিগণ যাহাকে কলিযুগের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিতে অনুরোধ ও আদেশ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণের কি সাধ্য ও সাহস যে তাঁহাদের ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া নূতন ব্যবস্থা, নূতন হুকুম জারি করিতে পারেন? পরাশরের তুল্য অন্য কোন ঋষি হইলেও না হয় মানিয়া লওয়া যাইত, কিন্তু পণ্ডিত-গণের কলম ঋষির উপর জারি করা নিতান্তই শোভন হয় নাই। ইহা যেমন দৃষ্টি ও শ্রুতি কটু তেমনি মূর্খতাব্যঞ্জক হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—পরাশর নিজে বিধি রচনা করিয়া নিজেই উহার প্রতিকূল মত কেন আদি পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতে যাইবেন?

তৃতীয়তঃ—ইহা আদি পুরাণের বচন। পুরাণের স্থান শাস্ত্রকারগণ স্মৃতিসংহিতার নিম্নে প্রদান করিয়াছেন। পুরাণের প্রামাণ্য ততটুকু, যতটুকু স্মৃতিসংহিতার সহিত উহার সমতা থাকে। স্মৃতিসংহিতার সহিত উহার যখনই—যে অংশই গরমিল ও মত দ্বৈধতা উপস্থিত করিবে তদ্দণ্ডেই—সেইটুকুই অগ্রাহ্য। যেহেতু শাস্ত্রকার বলিতেছেন :—

> শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধঃ যত্র দৃশ্যতে।
> তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥

অর্থাৎ যে স্থানে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইবে, তথায় বেদই প্রমাণ। আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে স্মৃতিই প্রমাণ। সুতরাং মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, ব্যাস ও যম-সংহিতার বচনের সহিত পুরাণ শাস্ত্র আদি পুরাণের বচনের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় উপরের শ্লোক অনুযায়ী আদি-পুরাণের ঐ বচন অগ্রাহ্য হইয়া গেল। বিশেষতঃ বেদব্যাস ঋষি

আপন রচিত সংহিতায় যাহা লিখিলেন তাহা কি আবার নিজের আদি পুরাণে খণ্ডন করিয়া দিবেন! ইহা সম্ভবপর মনে হয় না। নিজেই একস্থানে বিধি দিয়া আবার নিজেই উহা কি অবিধি বলিয়া লিখিতে পারেন? মনে হয় না। আমাদের মনে হয় ঐ শ্লোক অতি আধুনিক এবং আদিপুরাণে প্রক্ষিপ্ত না হইলেও উহা ন্যায়তঃ অগ্রাহ্য। আরও না হয় যদি বুঝিতাম যে, সংহিতাকার এক যোগে ভৃত্য, গোপাল, কুলমিত্রগণের অন্ন গ্রহণ যোগ্য বলিলেও আদিপুরাণের ন্যায় অন্যান্য পুরাণকারগণ ও উহার বিরুদ্ধে মত দিতেছেন, কিন্তু তাহা ত নয়। পৌরাণিক বিধিতেও উহার অনুকূল মতই লিখিত আছে।

যথাঃ—শূদ্রেষু দাস-গোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্না নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥
(গরুড়-পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ৯৫অ—৬৬)

অপিচ—

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রশ্চ গোপালঃ দাস নাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥
(কূর্ম্মপুরাণ, উপরিভাগ, ১৭অ—১৭)

এতৎ সঙ্গে আরও দুইটী বিশেষ বিধি কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

কুশীলবঃ কুম্ভকারঃ ক্ষেত্র-কর্ম্মকঃ এব চ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না দত্বা স্বল্পং পণং বুধৈঃ॥
(কূর্ম্মপুরাণ, উপরিভাগ, ১৭অ—১৮)

নট, কুম্ভকার, কৃষক ইহাদিগকে অল্পমূল্য দিয়া ইহাদের অন্ন ভোজন করিতে পারা যায়।

পায়সং স্নেহ-পক্কং যদ্গোরসশ্চৈব সক্তবঃ।
পিণ্যাকশ্চৈব তৈলঞ্চ শূদ্রাদ্ গ্রাহ্যং দ্বিজাতিভিঃ।
(কূর্ম্মপুরাণ, উপরিভাগ, ১৭অ)

পায়স, জলোপসেক ব্যতীত ঘৃতাদি স্নেহ দ্বারা পক্ক বস্তু (মোহনভোগ প্রভৃতি), শক্তু (ছাতু), পিণ্যাক (তিলের খৈল) ও তৈল এই সকল বস্তু ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেন। (১)

সাংহিতিক যুগের ন্যায় তৎপরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগেও কুম্ভকার, নরসুন্দর ও কৃষকাদির অন্ন ভোজ্যান্ন ছিল, উল্লিখিত বচন দ্বারা ইহা স্থির হইতেছে। দেশ কাল ও পাত্র অনুযায়ী শাস্ত্রের বিধি পরিবর্ত্তনশীল। ব্রাহ্মণ-শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ কলমের জোরে ইহাদিগকে শূদ্র সংজ্ঞায় অভিহিত করিলেও মনঃ প্রাণে জানিতেন ইহারা হীন শূদ্র নহে এবং কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায়িগণের বিপুল ঐশ্বর্য্য, অতুল ধন ধান্য, অমিত বৈভব দেখিয়া সহসা লোভও সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাই পায়সাদি মুখরোচক সুস্বাদু আহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অন্ন বাদ দিয়া এখানে শুধু পায়স, ঘৃতপক্ক মোহনভোগাদির ব্যবস্থা আছে! ফলতঃ এই সমস্ত কৃষক আদি জাতি কখনও শূদ্র ছিল না ইহা শাস্ত্রকারগণ মনঃ প্রাণে বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু নিজেদের গৌরব সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় জাতিকে তাঁহাদের বহু নিম্নে অবনত করিয়া রাখিবার জন্য ইহাদিগকে বৈশ্যাদি সংজ্ঞা হইতে অপসৃত করিয়াও ইহাদের মায়া—ইহাদের প্রদত্ত অন্ন ব্যঞ্জন পায়স মোহন-ভোগাদির মায়া ও লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। শুধু পুথিগত ভাবেই বহুদিন পর্য্যন্ত শূদ্র সংজ্ঞায় নাম লিখিয়া রাখা হইয়াছিল। কলমের খোঁচায় ইহাদিগকে যে শূদ্রত্বে পরিণত করা হইল, ইহা তাহাদিগকে কোন প্রকারেই জানিতে দেওয়া হয় নাই। অন্নাদি যথারীতি ব্যবহৃত হইত, সম্মানের কোন প্রকার লাঘব করা হইল না। এইরূপ ভাবে, কি বহুদিন অতিবাহিত হইবার পর, ব্রাহ্মণগণ সুযোগ ও সুবিধামত আপনাদের পুথিগত ব্যবস্থা তখন আস্তে

---

(১) পূর্ব্বে তেলি বা কলুরা এক জাতীয় শূদ্র ছিল, তাহারাই তৈল যোগাইত এখন কিন্তু ব্রাহ্মণের তৈল যোগায় মুসলমান কলু। শাস্ত্রমতে হিন্দুশূদ্রের তৈলই গ্রহণযোগ্য, মুসলমানের নহে। পণ্ডিত মহাশয়গণ কি বলেন ?

আস্তে কার্য্যে পরিণত করিয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বংশের অস্তিত্ব কলমের খোঁচায় শাস্ত্রের নামে লোপ করিয়া ফেলিয়াছেন, ফলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অস্তিত্ব লোপ পায় নাই—নামান্তর পরিগ্রহণ করিয়াছে মাত্র। বঙ্গে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের নাম না থাকিবার ইহাই মূল কারণ, ইহাই যুক্তি-সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা!

এইত ভূরি ভূরি শাস্ত্রের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম—এক্ষণে শাস্ত্র সর্ব্বস্ব বচন-বাগীশ হিন্দু-সমাজ কি এই বিধি মানিতে প্রস্তুত আছেন? এখন না মানিলেও শীঘ্রই মানিতে হইবে। বিংশ শতাব্দি সমুদয় জড়তা, সমুদয় গোঁড়ামী-নষ্টামী-ভণ্ডামীর মূল উপড়াইয়া ফেলিয়া তবে ছাড়িবে। তোমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পদ্মার পার ভাঙ্গার মত ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। কার সাধ্য ইহার গতি রোধ করে? গলা বাজিতে ও আর্য্যামীর ন্যাকামীতে এ ভাঙ্গা আর রোধ করিতে পারিতেছ না। মঙ্গলময় বিধাতা শ্রীহস্তে নূতন ভারতের নূতন সজীব হিন্দু সমাজ গঠনের পত্তন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন ভ্রান্ত সমাজপতি! বৃথাই ইহার গতি রোধ করিতে—অনর্থক গলাবাজী করিয়া—চীৎকার করিয়া শক্তি ক্ষয় করিতেছ মাত্র। তোমার শত চীৎকার, সহস্র আর্ত্তনাদ, সে নির্ব্বিকার নবসমাজগঠনকারী বিধাতা পুরুষের ইচ্ছাব গতি-রোধ করিতে সমর্থ হইবে না। শাস্ত্রের নামে কপটতা, ধর্ম্মের নামে প্রতারণা, ঋষিগণের নামে প্রবঞ্চনা, আর কতকাল চলিতে পারে? শাস্ত্রের নামে লোকাচার, দেশাচার, স্ত্রী আচার, কুলাচার এবং অনাচার-অত্যাচার দেশবাসীর, হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অবিচার যতটা করা সম্ভব—করা হইয়াছে। আর না। যথেষ্ট হইয়াছে। আর তর্কচূড়ামণি স্মৃতিরত্নের বেদ ব্যাখ্যায়, ন্যায়েব কচ্‌কচিতে, ঘটত্ব পটত্বের বাগ্‌-বিচারে, দেশবাসী তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না। আর তোমাদের ৬ জনের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া বাকি ৯৪ জন চোখে তৈল দিয়া ঘুমাইতেছে না। এইবার তাহারা জাগ্রত হইয়াছে, আপনাদের স্বার্থ, কল্যাণ ভালরূপেই বুঝিতে পারিতেছে। ধর্ম্মের নামে—শাস্ত্রের নামে—

ভূয়া জিনিষ দিয়া এতকাল তাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখা হইয়াছে। এখন তাহারা খাঁটি নকল বিলক্ষণই বুঝিতে পারিতেছে। স্ত্রী আচার লোকাচার দেশাচারের নামে দেশের অগণ্য লোককে কুক্কুর বিড়াল অপেক্ষাও ঘৃণিত ভাবে রাখা হইয়াছে। মঙ্গলময় শ্রীভগবানের প্রাণ-প্রিয় সন্তানগণকে, দেশের অস্থিমজ্জা স্থানীয় অগণ্য অধিবাসীকে, সমাজের—জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ কোটি কোটী প্রকৃতি পুঞ্জকে, ছুঁৎমার্গের দোহাই দিয়া অচল অস্পৃশ্য অব্যবহার্য্য পঙ্‌ক্তি নির্ব্বাসন করিয়া দিয়াছ। দেবালয়ের পবিত্র মণ্ডপেও তাহাদের প্রবেশ অধিকার বন্ধ করিয়া দিয়াছ। পবিত্র দেবমন্দির ঘৃণায় হিংসায় ছুঁৎমার্গে ক্রৌমি বিষ্ঠায় কলঙ্কিত করিয়াছ। পদদলিত নিপীড়িত বুভুক্ষিত জনমণ্ডলীর বুকের রক্ত দিয়া, ক্ষীণ কঙ্কাল দিয়া, মেদ মাংস দিয়া, দেব মন্দিরের উচ্চ চূড়া তুলিয়াছ কিন্তু উহাতে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই! তাহারা টাকা দিবে, পয়সা দিবে, অলঙ্কার দিবে, বস্ত্র দিবে, চাল দিবে, দাল দিবে কিন্তু একটু জল দিতে পারিবে না। কেন এ অবিচার? তুমি সমাজপতি গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ, মদ গর্ব্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে দূর দূর করিতেছ কিন্তু প্রভু ত আমার কাহাকেও ত্যাগ করেন না। তাঁহার কাছে সব সমান। তাঁর কাছে ত ছোট বড় নাই, তাঁর কাছে ত উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ নাই। তুমি অন্ধ জাত্য-ভিমানে স্ফীত হইয়া তাহাদিগকে মন্দি-রের ত্রিসীমানায় প্রবেশ করিতে দিতেছ না বরং দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছ—কিন্তু ঐ যে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, করুণার মহাজলধি, দয়ার আধাব, সর্ব্ব জীবের শরেণ্য বরেণ্য—প্রেমময় পিতা আমার ছল ছল নেত্রে কাতর দৃষ্টিতে বাহু প্রসারণ করিয়া ডাকিতেছেন—"ওরে যাদুনে যাদুনে ফিরে আয়, আমার বুকে আয়, এখানে ব্রাহ্মণের ভয় নাই পুরোহিতের চোখ্ রাঙ্গানি নাই, সমাজপতির কুটীল ভ্রূকুটী নাই। আমার কাছে চণ্ডাল নাই, পাড়িয়া নাই, মেথ নাই, মুদ্দাফরাস নাই, মুচি নাই, ডোম নাই, হাড়ি নাই ম্যাথর নাই, আয় আয়। কোলে আয়। আহা তোদের বড় বেদনা, বড কষ্ট,

তোদের ব্যথা যে আমি সইতে পারি না। মূঢ় অত্যাচারিগণ, ব্রাহ্মণাদি সমাজপতিগণ, তোদের শীর্ণ দেহে, কঙ্কাল শরীরে, দারিদ্র্য-দুঃখ-অত্যাচার-নিপীড়িত দুর্ব্বল অঙ্গে যতগুলি আঘাত দিয়াছে, যতবার পদদলিত করিয়াছে, লাথি জুতা মারিয়াছে—এই দেখ সবগুলিই আমার অঙ্গে, আমার পৃষ্ঠে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পতিত আর্ত্ত কাঙ্গাল যে আমার অভিন্নদেহ! আমার যাহারা অভিন্নদেহ, আমার যাহারা সন্তান, মূঢ় অভিজাতবর্গ বৃথা জাত্যভিমানে অন্ধ জ্ঞান শূন্য হইয়া তাহাদিগকে ঘৃণা অবজ্ঞা করিয়া, পদদলিত লাঞ্ছিত করিয়া আমারই লাঞ্ছনা করিতেছে, কিন্তু ইহাই শেষ নহে, ইহারও পরিণাম আছে। পিতার মন্দিরে কি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল উত্তম অধমের ভেদ আছে? পবিত্র দেব-মণ্ডপে কি উচ্চ নীচ, মহৎ ক্ষুদ্র, জাতি বিজাতি আছে? এখানে সকলের সমান প্রবেশ অধিকার। আমি যাহাকে কোল পাতিয়া গ্রহণ করি, মূঢ় ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে তাড়াইতে চায়। কি ভ্রান্তি! কি আস্পর্দ্ধা! কি গর্ব্ব!!"

কলিযুগ পাবনাবতার আমার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গও ত এইরূপ কথাই শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥

(মধ্যলীলা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।)

যে সুবর্ণবণিক জাতিকে মহারাজ বল্লাল সেন "বিষ্ঠার ক্রীমি-কীট তুল্য করিয়া ছাড়িব" বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন, যাহারা বিশুদ্ধ বৈশ্য বর্ণান্তর্গত হইয়াও বল্লালের অত্যাচারে সমাজে পতিত হইয়াছে, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ-গণের সহিত তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণ কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, পাঠকগণ শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবেন। প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যে জাতির অন্ন ব্রাহ্মণগণ সকলে মিলিয়া ভোজন করিতেন, তাহাদেরই কিনা আজ জল অচল! তাহারাই কিনা আজ অস্পৃশ্য—হেয়, অবজ্ঞাত, মন্দিরে প্রবেশাধিকার

বর্জ্জিত। অধিক দিনের কথা নহে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রেমাবতার মহাত্মা নিত্যানন্দদেব সপ্তগ্রামে সুবর্ণবণিক-বংশীয় উদ্ধারণ দত্তের গৃহে তৎকর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতেন ও সকলে মিলিয়া মহোৎসব করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামী মহাশয় তল্লিখিত 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' নামক বৈষ্ণব জগতের বিখ্যাত প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—"উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভু অম্বিকানগরে উপনীত হইয়াছেন। তথায় সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা শ্রীমতী বসুধা দেবীকে বিবাহ করার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে কুলাচার্য্যগণ তাঁহার পরিচয়, আহারাদি কিরূপে সম্পাদিত হয়, জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রশ্ন :—শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন।
স্বপাক করহ কিম্বা আছয়ে ব্রাহ্মণ ?

উত্তর :—প্রভু কহে কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি॥
এই মত পরিবর্ত্তরূপে পাক হয়।
শুনিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময়॥

প্রশ্ন :—তারা কহে এ বৈষ্ণব, হয় কোন্ জাতি।
পূর্ব্বাশ্রমে কোন্ নাম, কোথায় বসতি॥

উত্তর :—প্রভু কহে ত্রিবেণীতে বসতি উহার।
সুবর্ণবণিক দেখি করিনু স্বীকার॥
বৈশ্যকুলেতে জন্ম, হয় সদাচারী।
এ জন্য উহার অন্ন,ঘৃণা নাহি করি॥
সেই দিন হইতে নিত্য নিত্য মহোৎসব।
আসিয়া মিলয়ে যত আত্ম বন্ধু সব॥
প্রভু আজ্ঞামতে দত্ত করয়ে রন্ধন।
নিত্য নিত্য শত শত ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ॥—(শ্রীচৈতন্য ভাগবত।)

পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যে জাতির রন্ধন-অন্ন শত শত ব্রাহ্মণ নিত্য ভোজন করিতেন, পাঁচশত বৎসর পর সেই সুবর্ণবণিকজাতি জল স্পর্শে অযোগ্য অনাচরনীয়! কি পরিবর্ত্তন! অথচ বলা হয় "আর্য্য হিন্দু সমাজ কোনরূপ পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহে—শত অত্যাচারে, শত বিপ্লবেও ইহা অচল অটল, হিমাদ্রীর মত ঠিকই রহিয়াছে, কাহারও সাধ্য নাই ইহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে? কত কালাপাহাড় কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, কত বুদ্ধ রামমোহনই না হয়রান হইয়া গিয়াছে, তোমরা ২।১০ জন রাম শ্যাম পরিবর্ত্তন করিতে চাও, এত বড় দুরাশা তোমাদের? ইত্যাদি।" কিন্তু বিজ্ঞ পাঠকগণ দেখিতেছেন ভারতীয় হিন্দু সমাজ যেমন পরিবর্ত্তনশীল এমন পরিবর্ত্তনশীল বোধ হয় ভূমণ্ডলের কোন সমাজই নহে। কি ছিল আর কি হইয়াছে! স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিশ্রন ছিল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে বিবাহ ছিল, আহারাদি ছিল, দেবরাদির দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের নিয়ম ছিল, সমুদ্রযাত্রা, বিধবা-বিবাহ ছিল, সতীদাহ ছিল, কতই না ছিল এখন কোথায় সে গুলি? যাঁহারা অন্ধ তাঁহারাই বলিবেন, সনাতন হিন্দু সমাজের কখনও পরিবর্ত্তন হয় নাই কখনও হইবেও না। যে পবিত্র সুবর্ণ-বণিক জাতি চিরকাল বৈশ্য বলিয়া পরিচিত, যাঁহাদের কন্যা ব্রাহ্মণগণ বিবাহ করিয়াছেন, যাঁহাদের অন্ন ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বৈশ্য সুবর্ণবণিক জাতিকে, হীন চরিত্র পাপিষ্ঠ লম্পট বল্লালসেন নিজের খেয়ালমত পতিত পঙ্‌ক্তি-নির্ব্বাসিত করিলেন, আর সমাজপতি ভীরু কাপুরুষ, ভয়ে ভীত পরন্তু অর্থে প্রতিপালিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সেই অন্যায্য, অনার্য্যোচিত, সত্যবিরোধী মতকে ভগবান বেদব্যাসের মত বলিয়া শির পাতিয়া মানিয়া লইলেন। হা ধিক! হিন্দুসমাজের কর্ণধার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে! যাঁহাদের ভয়ে স্বর্গের দেবতাগণসহ ইন্দ্র পর্য্যন্ত কম্পবান্ ছিলেন, যাঁহাদের ভয়ে ভারতের ক্ষত্রিয় রাজন্যগণ সিংহাসনে বসিয়াও কম্পিত কলেবর থাকিতেন, যাঁহাদের সম্মান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত করিতেন বলিয়া বলা হইয়া থাকে সেই

ভূদেব ব্রাহ্মণগণ, ত্রিলোক পূজনীয়, ধর্ম্ম বেদ ও সত্যরক্ষক ব্রাহ্মণগণ আজ কিনা পাপিষ্ঠ বল্লালের অন্যায় অশাস্ত্রীয় অবৈদিক প্রার্থনা নয়,—অনুরোধ নয় ঘৃণিত আদেশ—বাক্য মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন না,—ব্রাহ্মণ্য-গৌরব অতল জলে ডুবাইয়া দিলেন। কার্য্য না করিয়া, ব্রাহ্মণের গৌরব রক্ষা না করিয়া, ব্রাহ্মণ্যতেজ বিকসিত না করিয়া, শুধু মুখে মুখে চীৎকার করিলেই ব্রাহ্মণ্য-গৌরব লাভ করা যাইবে না, ব্রাহ্মণ্যতেজ ফিরিয়া আসিবে না, তার জন্য সংযম চাই সাধনা চাই, তার জন্য ত্যাগ স্বীকার চাই, পরার্থপরতা চাই, তার জন্য তপস্যা চাই, সিদ্ধি চাই। বল্লালসেন ব্রাহ্মণগণের ক্ষমতা বিলক্ষণই অবগত ছিলেন, তাই হীন জাতীয় ডোম কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াও মনে করিয়া ছিলেন তাঁহার ঐশ্বর্য্য, তাঁহার সমর প্রভাবের ভয়ে কেহ তাঁহার অনুষ্ঠিত প্রিয় কার্য্যের প্রতিবাদ করিবেন না। কিন্তু তাহা হইল না, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘোরতর বিপ্লবের সূত্রপাত হইল। বল্লালসেন তদীয় অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যবতী নব প্রণয়িনী ডোমকন্যার অন্ন গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সমাজের সমুদয় ব্যক্তিকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিলেন, ইহাতে অনেকেই আপন আপন জাতি-ধর্ম্ম-কুল রক্ষার্থে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। বল্লালের ডোমকন্যা বিবাহ ও তাঁহাকে সমাজে চল করার অভিপ্রায় বিষয়ক কিঞ্চিৎ প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। কবিবর যদুনন্দন কৃত "ঢাকুরে" এইরূপ লিখিত আছে :—

* * * *

একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে ॥
ত্যজিয়া বিপিন রাজা গেল লোকালয়ে।
তথায় বসতি করে ডোমের আশ্রয়ে ॥
সেই রাত্রি তথায় রহিল উপবাসী।
মিলিলেক ডোম কন্যা প্রাতঃকালে আসি ॥

বিবাহ করিব বলি লৈয়া আইলা ঘরে।
যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা করে॥
যদি কালক্রমে রাজা শুনে নিন্দাবাণী।
সর্ব্বস্ব হরিয়া তারে তাড়ান তখনি॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনি করায় বিচার।
শাস্ত্রমতে কার্য্য করি কি দোষ আমার॥

মহারাজ বল্লালসেন ডোমকন্যা বিবাহ করিয়া এবং তাহার হস্তস্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিয়া জাতিচ্যুত হন নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে "পাঁতি" দিয়াছিলেন। এখন এ দেশে সমাজগর্হিত শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, ধর্ম্ম নিন্দিত কার্য্য করিয়াও লোকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ হইতে পাঁতি সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু এই সকল কার্য্য সমাজ ও দেশের যাবতীয় লোক একমতে গ্রহণ করিবে এ কথা বলা যায় না। এখনও এ দেশে কেহ জাতিচ্যুত হইতে হয় এরূপ কার্য্য করিলে তিনি স্বপক্ষে কতক লোক যে না পান তাহা নহে। অপিচ পাপানুষ্ঠানাকারীর অর্থ-সম্পদ-প্রতিপত্তির উপর তাঁহার সমর্থনকারীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

হিন্দু রাজা অসীম প্রতাপশালী বল্লাল—রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া, অস্পৃশ্য ডোমকন্যাকে নিজ অঙ্কশায়িনী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—সমাজে তাহাকে চালাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন—এবং পরিশেষে তাহাকে সমাজে চালাইয়াও ছিলেন।

"এই (ডোমকন্যা) পদ্মিনীর পাকস্পর্শ ব্যাপারে মহারাজ বল্লালসেন নিমন্ত্রণ করিলে বৈদ্যগণ তৎপুত্র লক্ষ্মণের উপদেশানুসারে স্ব স্ব উপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। এই উপলক্ষে বৈদ্যগণের মধ্যে লক্ষ্মণী ও বল্লালী দুইটী থাক হয়, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।" (১)

(১) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রণীত "বিক্রমপুরের ইতিহাস।"

'পদ্মিনী ডোমকন্যার পাকস্পর্শ ব্যাপার সত্য। কাহাকে লইয়া এই পাকস্পর্শ হইয়াছিল? প্রায় সকল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য-মহারাজের এই সমন্বয় ব্যাপারের কোন না কোন প্রকারে সংস্থষ্ট ছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ এই অনার্য্যাচার সহ্য করিতে পারেন নাই তাঁহাদিগকে দেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

"উৎপাত করিয়া রাজা না থুইলা দেশ।
স্ব স্থান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষ।

"এই অত্যাচারিত, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যগণ বল্লালের রাজত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান নোয়াখালি, কুমিল্লা, পূর্ব্বময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। সে সময় মধুপুরের বন নিবিড় জঙ্গল, গৌড় এবং কোচ রাজ্যের সীমান্ত দেশ ছিল। কালক্রমে এই প্রকৃত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য তেজঃ মণ্ডিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যগণ কোচ প্রভৃতি অনুন্নত জাতীয় রাজগণের রাজ্যে বাস করিয়া ক্রমশঃ তাঁহাদিগের পূর্ব্ব গৌরব ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন অথচ যে সকল ব্যক্তি রাজকোপ-ভয়ে অধর্ম্ম সমর্থন করিয়া দেশে ছিলেন তাঁহারা সমুন্নত প্রদেশে বাস নিবন্ধন ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে ছিলেন।

"মহারাজ বল্লালের এই কদাচার দুষ্ট ডোমকন্যা বিবাহ তৎকালীয় হিন্দু সমাজ অবনত মস্তকে সমর্থন করিয়াছিলেন। সেই হিন্দু বংশধরগণের—ডোমকন্যা অপেক্ষা উন্নত জাতি সমূহের হস্তে বর্ত্তমান সময়ে আহার ত দূরের কথা, জলটুকু গ্রহণেরও আপত্তি। হা! আচার-দোহাই-সর্ব্বস্ব হিন্দুসমাজ! তোমার কিই না অধঃপতন ঘটিয়াছে। ডোমকন্যায় অন্ন গ্রহণ চলিল, আর সাহা সুবর্ণবণিক মাহিষ্য—যোগী সূত্রধর নমঃশূদ্রগণের জলটুকু চলে না! তাহাতে জাতি যায়, ধর্ম্মযায়, ব্রাহ্মণ্য লোপ পায়!

"আর কৌলীন্য-গর্ব্ব-বিমূঢ় তুমি কুলীন, বল্লালের এই অশাস্ত্রীয় পতিত বিবাহ ধর্ম্মের শিরে পদাঘাত করিয়া সমর্থন ও অনুমোদন করিয়াছিলে, তাহার

ফলে গৌরবাত্মক উপাধি লাভ করিয়াছ এবং এখন ও শিরে সেই কলঙ্ক রাশি বহন করিয়া জন সমাজে কুলীন বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছ! যাঁহারা বল্লালের এই দুষ্কার্য্যের সহায় ও সঙ্গী ছিলেন তাঁহারাই উচ্চ সম্মান লাভ করিলেন! সে কালেও রাজানুগৃহীতের ভাগ্যে উপাধি লাভ হইত। বল্লালের এই অনুগ্রহ ও উপাধি দানের মূলে কি ছিল আমরা উপরে তাহার আভাস প্রদান করিলাম। বর্ত্তমান বল্লালী কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সংখ্যায়, ধনগৌরবে এবং বিদ্যার প্রভাবে বঙ্গদেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, যাঁহারা যে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সন্তান ডোমকন্যার অন্ন গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ ডোম অপেক্ষা কোটি গুণে সমুন্নত হিন্দু জাতির জলপান করিতে ধর্ম্মচ্যুত, জাতিভ্রষ্ট ও কুণ্ঠিত হইবেন কেন?" (১)

কিন্তু পাপিষ্ঠ বল্লালের অত্যাচার ও অবিচারের এইখানেই শেষ নহে। ইহার দ্বিতীয় কীর্ত্তি সুবর্ণবণিক প্রভৃতি বৈশ্যগণের পাতিত্ব বিধান ও দেশ হইতে নির্ব্বাসন! বল্লালের চরিত্রহীনতা, ধর্ম্মহীনতা, পরস্ত্রীতে লোভ, পরধনে অন্যায় হস্তক্ষেপ প্রভৃতির কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। একদা দুষ্ট বল্লাল রাজকোষে অর্থের অল্পতা হওয়ায় বিশেষ চিন্তিত হয়েন। ঐ সময়ে বাণিজ্যাদি দ্বারা সুবর্ণবণিক জাতি বিশেষ ধনবান্ হইয়া উঠিয়াছিল, বল্লাল তাহাদের অনেকের নিকটে অনেক মুদ্রা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাতে ও রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হওয়ায়, অবশেষে সুবর্ণবণিক জাতীয় মহা ধনবান্ বল্লভানন্দ আঢ্যের নিকট পুনরায় প্রচুর অর্থ ঋণ স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মণিপুরে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, সেই যুদ্ধের ব্যয় জন্য বল্লভানন্দের নিকট বল্লাল সেন পুনরায় ঋণ প্রার্থনা করেন। পূর্ব্ব প্রদত্ত ঋণ এখনও পরিশোধ হয় নাই দেখিয়া বল্লভানন্দ বল্লাল সেনকে পুনরায় ঋণ দিতে

(১) চারুমিহির, ১০ই শ্রাবণ, ১৩১৭ সাল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত "বল্লাল সেন ও কৌলীন্য প্রথা।"

অস্বীকার করেন, কিন্তু রাজা তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। বল্লভানন্দ শাসন পত্রেও বশীভূত হয়েন নাই।

তৎসকাশং ততোদূতো রাজ্ঞাতেন চ প্রেষিতঃ।
শাসন পত্র দানেন বশীকরণমিচ্ছতা ॥

(গোপালভট্ট কৃত "বল্লাল চরিত" ।

তখন বল্লাল সেন, বল্লভানন্দের প্রতি নানাপ্রকার কটুক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন—

সুবর্ণ-বণিজাং স্বামী বল্লভানন্দ নামকঃ।
আসীৎ দুষ্টো ধনশ্রেষ্ঠো রাজদ্রোহী চ গর্ব্বিতঃ ॥৯

(গোপালভট্ট কৃত "বল্লাল চরিত")

বল্লভানন্দকে হস্তগত করিতে অসমর্থ হইয়া, বল্লালসেন ধনবান্ সুবর্ণ-বণিকদিগের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন।

* * * *

জহার বণিজাং বলাৎ।
ব্যবহারে ধৃতং বস্তু কেষাঞ্চিৎ ক্রোশতামপি ॥"

অবশেষে যখন বল্লাল দেখিলেন, সুবর্ণ-বণিক জাতিকে একেবারে পর্য্যুদস্ত করা সহজসাধ্য নহে, তখন তাহাদিগকে অপমানিত করিবার জন্য, রাজবাটীর এক মহাভোজে নিমন্ত্রন করিলেন। সুবর্ণবণিকেরা উপস্থিত হইলে, শূদ্রদিগের সহিত তাঁহাদিগকে উপবিষ্ট করিতে আজ্ঞা দিলেন, বণিকেরা কহিল "আমরা বৈশ্য, বিশেষতঃ রাজবাটীতে আমরা ইতঃপূর্ব্বে বৈশ্যসঙ্গে একত্রে বসিয়া আহার করিয়াছি, সুতরাং এরূপ অসামাজিক ও অশাস্ত্রীয় আজ্ঞা পালন করিয়া আমরা শূদ্রের সহিত একত্রে উপবেশন পূর্ব্বক আহার করিতে সম্মত হইতে পারি না।"

ভুজ্যমানেষু সর্ব্বেষু বল্লালেন মুদা সহ ॥
সৎশূদ্রাণাজনাস্তত্রাপরা ভোজন শালিকাঃ।

স্পর্দ্ধয়া বিবিক্ত ভোক্তুং বিশাংন দৃশ্যতেস্থলী॥
তস্মিন্নবসরে বৈশ্যা মন্ত্রয়ন্তঃ পরস্পরম্।
উক্তস্তু নির্য্যাতু কামাস্তদানীং রাজসঘনঃ॥

(আনন্দ ভট্টকৃত "বল্লাল চরিত")

অতঃপর সুবর্ণ-বণিকেরা ভোজনশালা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। রাজা বল্লাল সেন এ কথা শুনিয়া কহিলেন "কি। এত বড় স্পর্দ্ধা"—

"ঈদৃশী স্পর্দ্ধা, ইত্যুক্তা তান বাক্ষিপৎ" (বল্লাল চরিত্র—২২ অধ্যায়)

অল্প দিবস পরে, বল্লালসেন ক্রোধোন্মত্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন "যদি দুঃশীলান্ সুবর্ণবণিজঃ অধম জাতীয়ানাং মধ্যে ন গণয়িষ্যামি, বল্লভানন্দস্য দুরাত্মনঃ সমুচিত দণ্ডবিধানং ন করিষ্যামি, তদা গো-ব্রাহ্মণ যোষিদাদি ঘাতেন যানি পাতকানি ভবিতব্যানি, তানি মে ভবিষ্যন্তীতি। অন্ধরাজস্য শতপুত্র-বিনাশায় ভীমসেনো যাদৃশীং প্রতিজ্ঞামকরোৎ, এতেষাং সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা মে তাদৃশী জ্ঞাতব্যা। যদি দাম্ভিক-বল্লভানন্দ-বণিকস্যদুরাত্মনো দণ্ডং ন বিধাস্যামি তদা পাতকানি ভবিতব্যানি।" অর্থাৎ "আমি যদি দুষ্টস্বভাব সুবর্ণবণিক-গণকে নীচ জাতীয় মধ্যে ভুক্ত না করি এবং দুরাত্মা বল্লভানন্দকে সমুচিত দণ্ড বিধান না করি, তাহা হইলে গো ব্রাহ্মণহত্যার মহাপাতক হইবে। ধৃতরাষ্ট্রের শত শত পুত্র বিনাশে ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা যদ্রূপ, সুবর্ণবণিকজাতি সম্বন্ধে আমার এই প্রতিজ্ঞাও তদ্রূপ ইহা নিশ্চয় জানিবে।"

ইহার কিছুদিন পরে বল্লালসেন এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞো-পলক্ষে সুবর্ণ নির্ম্মিত ধেনু ব্রাহ্মণদিগকে দান করা হইয়াছিল। রাজা বল্লালের কুপরামর্শানুসারে একজন ব্রাহ্মণ একটা হিরণ্ময় গাভী শ্রীবিন্দপাইন নামে জনৈক সুবর্ণবণিক জাতীয় সওদাগরকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। (১) শ্রীবিন্দ

(১) মতান্তর—মণিদত্ত নামক বল্লভানন্দের ভাগিনেয়ের নিকট জনৈক ব্রাহ্মণ রাজ-প্রদত্ত স্বর্ণধেনু গচ্ছিত রাখিয়া কিছু অর্থ ধার লয়েন, পরে লোভপরবশ হইয়া মণিদত্ত ঐ স্বর্ণধেনু-গ্রহণ অস্বীকার করেন এবং উহা অগ্নিতে দ্রব করেন। রাজা বল্লালের বিচারে মণিদত্তের প্রতারণা সাব্যস্ত হয় এবং সেই অপরাধে সমুদয় স্বর্ণ-জাতিকে "পতিত" করেন।

পাইন উহা ভগ্ন করিয়া অগ্নিতে দ্রব করিয়াছিলেন এবং তৎপরে সেই স্বর্ণ দ্বারা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, বল্লালসেন এইরূপ শ্রবণ করিয়া সভামধ্যে কহিলেন "ইহাতে নিশ্চয়ই গো-হত্যার অপরাধ হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে, অগ্নিতে গো-দাহনের মহাপরাধ ঘটিয়াছে। অতএব সুবর্ণবণিক জাতি অদ্য হইতে অধম শূদ্রজাতি মধ্যে গণ্য হইল।" এতদিনে প্রতিহিংসা-পরায়ণ রাজা বল্লালসেনের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইল। "অদ্যাবধি ক্রিয়াহীনানাং বণিজাং যজ্ঞোপবীত-ধারণং ব্যর্থং এতেষাং ক্রিয়াভাবাৎ শূদ্রত্বং জাতম্। অতোদ্য পর্য্যন্তং এতে বণিজঃ শূদ্রাঃ, এতেষাং শূদ্রবৎ ক্রিয়াদিকং ভবিষ্যতি। বিশেষতস্ত স্বর্ণবণিজঃ সর্ব্বে গোস্তেয়া গোহত্যাকারিণশ্চ তদেতে অদ্যপর্য্যন্ত পতিতাঃ, শিষ্টৈরগ্রাহ্যাঃ।" পাঠক মহাশয়েরা বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে এই কারণেই বল্লালের সময় হইতে অনেকে সুবর্ণবণিক জাতিকে "পতিত" বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন কিন্তু আমরা নিরপেক্ষভাবে বলিতে বাধ্য যে বিনাপরাধে সুবর্ণবণিক জাতি দুষ্ট বল্লাল কর্ত্তৃক 'পতিত' বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল।"

সুবর্ণ-বণিকগণের ন্যায় অন্যান্য বৈশ্যবণিকগণ ও বৈশ্যকৃষকগণ কতক বল্লালের কোপে, কতক সমাজপতি ব্রাহ্মণগণের কৃপাবঞ্চিত হইয়া এবং কতক বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৈদিক আচার ভ্রষ্ট হইয়া সমাজে অনাচরণীয় হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ ইহারা কেহই হীন শূদ্রবর্ণ নহে--পতিত জাতি নহে। কাল প্রভাবে ইহাদের পাতিত্ব ঘটিয়াছে। এখন ইহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির ন্যায় আচার ব্যবহারে বিদ্যা বুদ্ধিতে ইহারা বহুলাংশে উন্নত হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং ইহাদিগকে আর হীনতর ভাবে রাখা কিছুতেই সঙ্গত নহে। সামাজিক অধিকার দান করিয়া ইহাদের হাত ধরিয়া তুলিয়া লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আর হীন ঘৃণিত অবজ্ঞাত ভাবে রাখা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবেনা। এখন আর রাজকোপ নাই, ব্রাহ্মণগণেরও কোনরূপ ঘৃণা বা বিদ্বেষের কারণ নাই—অনাচার

বিদ্যাদিহীনতাও নাই; সুতরাং কেন আর অগণ্য দেশবাসী ভ্রাতৃগণকে জল অচল করিয়া রাখি এবং তাহাদিগের মনে দারুণ বেদনা বিদ্ধ করি? তমোগুণ অনাচার ম্লেচ্ছাচার প্রভৃতির জন্যই জল অচল করা হইয়াছিল। "ভোজন সম্বন্ধে প্রাচীন বিধি সমস্তই এক্ষণে লোপ পাইয়াছে—কেবল, ইহার সঙ্গে খাইতে নাই, উহার সঙ্গে খাইতে নাই—এইরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা লোকের মধ্যে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। শত শত বর্ষ পূর্ব্বে আহার সম্বন্ধে যে সকল সুন্দর নিয়ম ছিল, এক্ষণে তাহার ভগ্নাবশেষ স্বরূপ এই স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচার মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুতিতে একটী প্রসিদ্ধ বাক্য আছে "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ"—যখন আহার শুদ্ধ হয় তখন সত্ত্বশুদ্ধ হয়, আর সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে স্মৃতি অর্থাৎ ঈশ্বরস্মরণ অথবা অদ্বৈতবাদীর মতে নিজ পূর্ণতার স্মৃতি অচল ও স্থায়ী হয়। এই বাক্যটী লইয়া ভাষ্যকারদিগের মধ্যে মহাবিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ কথা এই সত্ত্ব শব্দের অর্থ কি? আমরা জানি সাংখ্যদর্শন মতে আর ভারতীয় সকল দর্শন সম্প্রদায়ই একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই দেহ ত্রিবিধ উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। সাধারণ লোকের ধারণা এই, ঐ তিনটী গুণ, কিন্তু তাহা নহে; উহারা জগতের উপাদান কারণ স্বরূপ। আর আহার শুদ্ধ হইলে এই সত্ত্ব পদার্থ নির্ম্মল হইবে। বিশুদ্ধ সত্ত্বলাভ করাই বেদান্তের একমাত্র কথা। আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জীবাত্মা স্বভাবতঃ পূর্ণ ও শুদ্ধ স্বরূপ, আর বেদান্ত মতে উহা রজঃ ও তমঃ পদার্থদ্বয় দ্বারা আবৃত। সত্ত্ব পদার্থ অতিশয় প্রকাশ স্বভাব, আর যেমন আলোক সহজেই কাচকে ভেদ করে, তদ্রূপ আত্ম চৈতন্যও সহজেই সত্ত্ব পদার্থকে ভেদ করিয়া থাকে। অতএব যদি রজঃ ও তমঃ গিয়া কেবল সত্ত্ব দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে, তবে জীবাত্মার শক্তি ও বিশুদ্ধত্ব প্রকাশিত হইবে; অতএব এই সত্ত্বলাভ করা অত্যাবশ্যক। আর শ্রুতি এই সত্ত্ব লাভের উপায় স্বরূপ বলিয়াছেন, "আহার শুদ্ধ হইলে সত্ত্ব শুদ্ধ হয়।" রামানুজ এই আহার শব্দ খাদ্য অর্থে

গ্রহণ করিয়াছেন। আর ইহা তিনি তাঁহার দর্শনের একটি প্রধান অবলম্বন স্তম্ভ স্বরূপ করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, সমগ্র ভারতের সকল সম্প্রদায়েই এই মতের প্রভাব অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এখানে আহার শব্দের অর্থ কি, এইটী আমাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ রামানুজের মতে এই আহার শুদ্ধি আমাদের জীবনের একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। রামানুজ বলিতেছেন, খাদ্য তিন কারণে অশুদ্ধ বা দোষযুক্ত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জাতি দোষ —যে সকল আহার্য্য বস্তু স্বভাবতঃই অশুদ্ধ; যেমন পেঁয়াজ, লশুন প্রভৃতি, সেইগুলি খাইলে জাতি-দুষ্ট খাদ্য খাওয়া হইল। ঐ সকল খাদ্য অধিক পরিমাণে খাইলে কাম রিপুর প্রাবল্য হয় এবং সে ব্যক্তি ঈশ্বর ও মানবের চক্ষে ঘৃণিত ও অসৎ কর্ম্ম সকল করিতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ আশ্রয় দোষ—যে ব্যক্তির হাত হইতে খাওয়া যায়, সে ব্যক্তি খারাপ লোক হইলে সেই খাদ্য ও দুষ্ট হইয়া থাকে। অসৎ ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে; কারণ, এরূপ অন্ন ভোজন করিলে মনে অপবিত্র ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেও যদি সে ব্যক্তি লম্পট ও কুক্রিয়াসক্ত হয়, তবে তাহার হাতে খাওয়া উচিত নয়। তৃতীয়তঃ নিমিত্ত দোষ—খাদ্য দ্রব্যে কেশ, কীট, আবর্জ্জনাদি কিছু পড়িলে তাহাকে নিমিত্ত দোষ বলে। * * এই ত্রিবিধ দোষ-নির্ম্মুক্ত খাদ্য আহার করিতে পারিলে সত্ত্ব শুদ্ধি হইবে।"

"তবে ত ধর্ম্মটা বড় সোজা ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল! যদি বিশুদ্ধ খাদ্য খাইলেই ধর্ম্ম হয়, তবে সকলেই ত ইহা করিতে পারে! জগতে এমন কে দুর্ব্বল বা অক্ষম লোক আছে, যে আপনাকে এই দোষ সমূহ হইতে মুক্ত করিতে না পারে? অতএব শঙ্করাচার্য্য এ আহার সম্বন্ধেই কি অর্থ করিয়াছেন দেখা যাউক। শঙ্করাচার্য্য বলেন, আহার শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয় দ্বারা মনের মধ্যে যে চিন্তারাশি আহৃত হয়। উহা নির্ম্মল হইলে, সত্ত্ব নির্ম্মল হইবে, তাহার পূর্ব্বে নহে। তুমি যাহা ইচ্ছা খাইতে পার! যদি কেবল পবিত্র-

ভোজনের দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হয়, তবে বানরকে সারা জীবন দুধ ভাত খাওয়াইয়া দেখ না কেন, সে একজন মস্ত যোগী হয় কি না। এরূপ হইলে ত গাভী হরিণ প্রভৃতিরাই সকলের অগ্রে বড় যোগী হইয়া দাঁড়াইত—

নিত নহনেসে হরি মিলে ত জল জন্তু হই।
ফলমূল খাকে হরি মিলে ত বাদুড় বাদ্‌রাই
তিরণ ভখনকে হরি মিলে ত বহুৎ হয় হ্যায় অজা
দুধ পিকে কে হরি মিলে ত বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম সে না মিলে নন্দলালা॥

যাহা হউক এই সমস্যার মীমাংসা কি? উভয়ই আবশ্যক। অবশ্য শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন, উহাই মুখ্য অর্থ; তবে ইহাও সত্য যে, বিশুদ্ধ ভোজনে বিশুদ্ধ চিন্তার সহায়তা করে। উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, উভয়ই চাই। তবে গোল এই টুকু দাঁড়াইয়াছে যে বর্ত্তমান কালে আমরা শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ ভুলিয়া গিয়া কেবল 'খাদ্য' অর্থটী লইয়াছি। এই কারণেই যখন আমি বলি, "ধর্ম্ম রান্না ঘরে ঢুকিয়াছে," তখন লোকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়া উঠে। কিন্তু যদি তোমরা আমার সহিত মান্দ্রাজে যাও—তবে তোমরাও আমার সহিত একমত হইবে। তোমরা বাঙ্গালীরা তাহাদের চেয়ে ঢের ভাল। মান্দ্রাজে যদি কোন ব্যক্তি উচ্চ বর্ণের খাদ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে তাহারা সেই খাবর দাবার ফেলিয়া দিবে। কিন্তু তথাপি তথাকার লোকেরা ইহার দরুণ যে বিশেষ কিছু উন্নত হইয়াছে, তাহা ত দেখিতে পাইতেছি না। যদি কেবল এ খাওয়া ও খাওয়া ছাড়িলেই, এর ওর দৃষ্টিদোষ হইতে বাঁচাইলেই লোকে সিদ্ধ হইত, তবে দেখিতে—মান্দ্রাজীরা সকলেই সিদ্ধ পুরুষ হইত কিন্তু তাহারা তাহা নহে।" (১)

"শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এখন সমস্তই চলিয়া গিয়াছে—এখন কেবল এই টুকুতে

কলিকাতায় স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতা—"সর্ব্বাবয়ব বেদান্ত।" ভারতে বিবেকানন্দ ১৬১—২৬৩ পৃষ্ঠা।

ঠেকিয়াছে যে, আমাদের আপনার লোক না হইলে তাহার হাতে আর খাওয়া হইবে না—সে ব্যক্তি হাজার জ্ঞানী ও উপযুক্ত লোক হউক। ময়রার (মিঠাইবিক্রেতার) দোকানে গেলে এই সকল নিয়ম যে কিরূপ উপেক্ষিত হইয়া থাকে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবে। দেখিবে মাছি সব চারিদিকে ভন্ ভন্ করিয়া উড়িয়া দোকানের সব জিনিষে বসিতেছে, রাস্তার ধূলা উড়িয়া মিঠাইএর উপর পড়িতেছে আর ময়রার পোরও কাপড়-খানা এমনি যে চিম্‌টি কাটিলে ময়লা উঠে। * * * পূর্ব্বকালে লোক সংখ্যা অল্প ছিল—তখন যে সকল নিয়ম ছিল, তাহাতেই কাজ চলিয়া যাইত। এখন লোক সংখ্যা বাড়িয়াছে—অন্যান্য অনেক প্রকার পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে। আমাদের এতদিন উৎকৃষ্টতর বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ণ করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা উন্নতি না করিয়া ক্রমশঃ অবনতই হইয়াছি। মনু বলিয়াছেন জলে থু থু ফেলিও না, আর আমরা করিতেছি কি? আমরা গঙ্গায় ময়লা ফেলিতেছি। * * * এখন তাহা সব চলিয়া গিয়াছে। এই কারণেই যদি কেহ আমাকে 'হিন্দু কে?' এই প্রশ্ন করে, তবে আমাকে নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিতে হইবে, কারণ, আমি ত প্রকৃত হিন্দু কাহাকেও দেখিতে পাই না। প্রকৃত হিন্দুচিত গুণ-সম্পন্ন যখন কাহাকেও দেখিতে পাই না, তখন বাধ্য হইয়া যে আমার সহিত একসঙ্গে খায় অথবা আমার বংশে বিবাহ করে তাহাকেই হিন্দু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অতএব দেখিতেছ, এখন কেবল এই স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচার রহিয়াছে, মন কলুষিত হইয়াছে, লোকে আসল জিনিষটাই ভুলিয়াছে। চোর, লম্পট, মাতাল, অতি ভয়ানক জেল-খাটা আসামী—ইহাদিগকে আমরা স্বচ্ছন্দে জাতে লইব, কিন্তু যদি একজন ভাল লোক অপর জাতীয় একজন ভাল লোকের সঙ্গে বসিয়া খায়, তবে সে তৎক্ষণাৎ জাতিচ্যুত হইবে—তাহার উদ্ধারের আর উপায় নাই। ইহাতেই আমাদের দেশে ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে। সুতরাং এইটাই স্পষ্টরূপে জানা উচিত যে পাপীর সংসর্গে পাপ এবং সাধুর সঙ্গে সাধুতা আসিয়া

থাকে আর অসৎ সংসর্গ দূর হইতে পরিহার করাই বাহ্যশৌচ। আভ্যন্তর শুদ্ধি আরও কঠিন।" (১)

আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে ত্রিবিধ দোষের কথা বর্ণিত হইল, পাঠকগণকে এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে অনুরোধ করি। (১) জাতি-দোষ (২) আশ্রয় দোষ (৩) নিমিত্ত দোষ। সমাজপতি পণ্ডিত মহাশয়গণ প্রথম ও তৃতীয় দোষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, অন্ধ ও বধির, কেবল দ্বিতীয়টীকেই আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু ইহারও যদি মূল—প্রকৃত তত্ত্ব ধরিতেন তাহা হইলেও আমাদের অধিক কিছু বলিবার ছিল না। তাঁহারা মূল তত্ত্ব প্রকৃত উদ্দেশ্য ছাড়িয়া দিয়া নারিকেল ফলের শাঁস ত্যাগ করিয়া বাহিরের ছোবড়া লইয়া ব্যস্ত হইয়াছেন এবং মাঝে মাঝে "ধর্ম্ম গেল" "ধর্ম্ম গেল" শব্দে গগনমণ্ডল কম্পিত করিতেছেন, দ্বিতীয়টীকে বলা হইল আশ্রয় দোষ। অর্থাৎ অসৎ, দুষ্ট, পাপী, অধার্ম্মিক, শৌচ-পরিভ্রষ্ট সত্যহীন তমোভাবাপন্ন ব্যক্তির আশ্রয়ে সংস্পর্শে খাদ্য দ্রব্য কলুষিত হয় এবং তদাহারে সাধুব্যক্তিগণের চিত্ত ও মলিন হয়। যেমন অম্ল-দ্রব্য পিত্তল বা কাংস দ্রব্যের স্পর্শে তিক্ত বিষাক্ত হয় তেমনি অসৎ পাপী লোকের সংস্পর্শে খাদ্যদ্রব্য কলুষিত, বিষাক্ত, তমঃগুণ বর্দ্ধক হইয়া থাকে।

অসতের স্পর্শে খাদ্যদ্রব্য অসৎভাবোদ্দীপক হয়, ইহাই হইতেছে শাস্ত্রকারের বক্তব্য। শাস্ত্রকার অবশ্য একথা বলিতেছেন না যে, অসতের পরবর্ত্তী ৫২ পুরুষ বা ৩৬০ পুরুষ পর্য্যন্তও অসতই থাকে এবং তাহাদের সংস্পৃষ্ট খাদ্যও অসৎভাবোদ্দীপকই হইয়া থাকে। দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পুত্র কিছু হিরণ্যকশিপু হয় নাই, রত্নাকর বা জগাই মাধাই কিছু চির কালই রত্নাকর বা জগাই মাধাই ছিল না বা থাকিতে পারে এমন কোন কথা নাই। শাস্ত্রকার ব্যক্তিগত ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, সমষ্টিগত ভাব বা বংশগত

---

(১) শিয়ালকোটে বিবেকানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতা "ভক্তি"। ভারতে বিবেকানন্দ ৩০৪—৩০৬ পৃষ্ঠা।

ভাবে উল্লেখ করেন নাই। পাপীর বংশেও পুণ্যবান সন্তান, অসতের কুলেও সৎপুত্র জন্মগ্রহণ করিতেছেন, মূর্খ বংশেও বিদ্বান, গরীবের ঘরেও ধনবান্ জন্ম গ্রহণ করিতেছেন। পক্ষান্তরে পণ্ডিতের গৃহেও মূর্খ, ধার্ম্মিক বংশেও কুলাঙ্গার, গঙ্গাজলেও গজার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। সাহা কুলের কোনও একজন উর্দ্ধতন পুরুষ না হয় মানিয়াই লইলাম সুরা বিক্রয় করিয়াছে, সুবর্ণ বণিক কুলের উর্দ্ধতন ৫২ পুরুষ পূর্ব্বেই না হয় ব্রাহ্মণের সুবর্ণ ধেনু অপহরণ বা প্রতারণাই করিয়াছিল, সূত্রধরকুলের ৫৫৭ পুরুষ পূর্ব্বে একজন না হয় যজ্ঞ-কাষ্ঠ দিতে বিলম্বই করিয়াছিল, নমঃশূদ্রকুলের আদি পুরুষ কশ্যপ ঋষি না হয় ঋতুর প্রথম দিন সন্তান উৎপাদন করিয়া ভ্রমই করিয়াছিলেন, গোয়ালার ৮৯২ পুরুষের উর্দ্ধতন একজন না হয় গরুই দাগাইয়াছিল। ধোপার ১৫৬৩ পুরুষ পূর্ব্বের একজন উর্দ্ধতন বেকুব পুরুষ না হয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি ভদ্রলোকগণের কাপড় কাচিয়া মহাপরাধের কার্য্যই করিয়াছিল, মালী না হয় হিন্দু সমাজপতিগণের বাড়ী-ঘর ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কবিয়া মহাপাপের কার্য্যই করিয়াছিল, তাই বলিয়া কি তাহার অধঃস্তন ৫০০ পুরুষও জল স্পর্শ করিতে পারিবে না? কেন পারিবে না? শাস্ত্রকি মানা করিতেছেন? ৫০০ পুরুষ পূর্ব্বে কাহার প্র প্র প্র প্রবৃদ্ধ পিতামহ হাতে লাল রং মাখিয়াছিল, এখনও কি সেই রং অধঃস্তন বংশধরের হাতে লাগিয়া আছে? না থাকিতে পারে? কাহারও উর্দ্ধতন ৭০০ পুরুষ হয়ত একদিন নিমন্ত্রণ খাইয়া হজম করিতে না পারিয়া বমন করিয়াছিল, এখন কি এই নিয়ম হইবে যে ৭০০ বৎসর পরবর্ত্তী পুরুষ পর্য্যন্ত কেহই নিমন্ত্রণ খাইতে পারিবে না; কেন না নিমন্ত্রণ তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের এক জনের হজম্ হয় নাই। এই উত্তরে বালিকা সন্তুষ্ট হইতে পারে, শিশু বাহবা দিয়া পাণ্ডিত্যের গৌরব করিতে পারে। বালক "কি চমৎকার দার্শনিক যুক্তি"—"অকাট্য প্রমাণ" বলিয়া হাতে তালি দিয়া নাচিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান-বিদ্যা-পূর্ণ, বিজ্ঞান দর্শনময় ন্যায়

যুক্তির যুগে ইহা উন্মাদের প্রলাপ উক্তি ভিন্ন আর কিছু বলিয়া বিবেচিত হইবে না। শাস্ত্র এমন কোন কথা বলিতেছে না যে, ব্রাহ্মণ বংশে যত অধমই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, তাহার খাদ্য জল গ্রাহ্য; আর শূদ্রবংশে যত উত্তমই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, তাহার খাদ্য জল অস্পৃশ্য অগ্রাহ্য। শাস্ত্রে সেরূপ কোন কথা লিখিলে তাহা কর্ম্মনাশার গভীর জলে নিক্ষেপ করিতে বলিতাম।

শাস্ত্রকার ত একথা বলিতেছেন না যে ব্যভিচারী বেশ্যাশক্ত লম্পট উপদংশবিষ জর্জ্জরিত চরিত্রহীন ব্যক্তির অন্নও নির্ব্বিচারে খাওয়া যাইতে পারে যদি তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। অথবা শাস্ত্রকার একথাও বলিতেছেন না যে মিথ্যাবাদী শঠ প্রতারক প্রবঞ্চক অনাচার দুষ্ট মৎস্য মেষ ছাগ কপোত হংস চক্রবাক কচ্ছপ প্রভৃতি মাংস খাদক মদ্যপায়ী গঞ্জিকাসেবী রক্ষিতা নারীপ্রণয়বদ্ধ ব্রাহ্মণের অন্ন খাওয়া যাইতে পারে কিন্তু তথাপি শূদ্রের অন্ন খাওয়া যাইতে পারে না। অথবা শাস্ত্রত একথা বলিতেছেন না যে ঝি চাকরাণীর প্রণয় মুগ্ধ ঘৃণিত জঘন্য ব্যাধিমণ্ডিত সন্ধ্যা-পূজা-বর্জ্জিত বারবিলাসিনী-সংশ্রব-দূষিত অনাচার-কলুষিত শুধু পৈতা মাত্র সর্ব্বস্ব পাচক বামুন ঠাকুরের অন্ন নিঃসন্দেহে গ্রাহ্য কিন্তু পবিত্র চরিত্র ধর্ম্মশীল দেব-দ্বিজ-অতিথি-পরায়ণ নিত্যস্নায়ী নিরামিশাষী বিশুদ্ধদেহ শূদ্রের অন্ন অগ্রাহ্য। কত গুরু পুরোহিত প্রকাশ্যে—বাড়ীতে রক্ষিতা নারী রাখিয়াছেন, কত সমাজপতি টিকিধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রকাশ্যে ব্যভিচার করিতেছেন, অগম্যা গমন করিতেছেন, পণ্ডিতে পণ্ডিতে মিলিয়া বেশ্যাবাড়ী ব্যভিচারিণীর বাড়ী বিশুদ্ধ বৈদিক ভাষায় সম্ভাষণাদি প্রণয়ালাপ করিতেছেন, কত স্মার্ত্ত চূড়ামণি ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য বংশ, গুরুবংশ, মদ্যপান গঞ্জিকা সেবন করিতেছেন অন্ধ সমাজ তাহা দেখিবে না, তাহাদের হাতের অন্ন খাইতে বারণ করিবে না কিন্তু কেহ যদি ভুলক্রমেও শূদ্রের হস্তে অন্ন গ্রহণ করে তবে আর তাহার নিস্তার নাই। কেন হে বাপু এ অত্যাচার অবিচার। শাসন করিতে পার যদি

ত সকলকেই শাসন কর আর না পারত হাল ছাড়িয়া দাও। সবলকে ছাড়িয়া দুর্ব্বলের উপর পীড়ন কর কেন? ধর্ম্মে তাহা সইবে কেন? ধর্ম্মের নিকট এ অত্যাচার কতদিন চলিবে? অত্যাচারের ফল ত হাতে হাতেই পাইতেছে। তাহাতেও কি শিক্ষা হইবে না? কত সমাজ-শিরোমণি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দেখিতেছি যাঁহারা রাত্রিতে নিম্নশ্রেণীর রক্ষিতা প্রণয়িণীর গৃহে তদীয় শ্রীহস্ত তৈয়ারী নানাবিধ খাদ্য আহার করিতেছেন ও প্রভাতে বাটী আসিয়া "বিলাত যাত্রীর" কিছুতেই প্রায়শ্চিত্ত নাই—তুষানলেও তাহার পাপ দূরীভূত হইবে না বলিয়া অজ্ঞ-জনগণের নিকট শাস্ত্রীয় বচন আওড়াইতেছেন। নিজে টাকা লইয়া ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছেন কিন্তু ওদিকে কেহ পাগল অবস্থায় কাহারও জল ভাত খাইয়াছে—এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নগদ মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তের "পাঁতি" লিখিয়া দিতেছেন। কোন তর্কসিদ্ধান্তের অবস্থা জানি যিনি বিধবা পুত্রবধূ গমন করিয়াও সমাজপতি বড় পণ্ডিতের বিদায় পাইয়াছেন এবং তিনিই কত লোকের প্রায়শ্চিত্তের পাঁতি লিখিয়া দিয়া, ব্যবস্থা পত্র দিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতিদান করিতেছেন। কত পণ্ডিতের চরিত্রহীনতা ব্যভিচার অনাচারের কথা যে জানি তাহা লিখিবার যোগ্য নয়। আর ইহাঁরাই কিনা সমাজের দণ্ডদাতা বিধাতা পুরুষ। ইহাদের অঙ্গুলি হেলনেই হিন্দু-সমাজকে চলিতে হইবে। কত সমাজ-পতি ব্রাহ্মণ মহাত্মাগণকে দেখিতেছি যাঁহারা প্রতিদিন নিয়মিত মদ্যপায়ী বেশ্যাগমনকারী, যাঁহারা ষ্টিমারে উঠিলেই মুসলমান বাবুর্চ্চি প্রস্তুত অখাদ্য মুরগীর মাংস দিয়া অন্নাহার করিতেছেন। এবং বাটী আসিয়াই বিলাতযাত্রী দেশবাসী আত্মীয়কে একঘরে করিবার জন্য দল পাকাইতেছেন এবং সহস্র কণ্ঠে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করিতেছেন। অথবা সামান্য সামান্য সামাজিক অপরাধের জন্য দুর্ব্বল স্বজাতীয় ভ্রাতাকে সকলে মিলিয়া একঘরে করিয়া রাখিতেছেন। যাঁহারা দেবী স্বরূপিণী গৃহস্তের বিধবা কন্যাকে নানাবিধ আর্থিক ও সুখের প্রলোভন

দেখাইয়া তাহার সর্ব্বস্বহরণ করিয়া নরক রাজ্যের দ্বার পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছেন—তাঁহারাই বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে সভা সমিতি করিয়া—ব্রহ্ম-চর্য্যের মাহাত্ম্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন! কত লিখিব! সমাজপতিগণের পাপেই, অহরহঃ অনুষ্ঠিত গুপ্ত পাপেই হিন্দু-সমাজের—হিন্দু-জাতির এই শোচনীয় পরিণাম! তুমি বড় লোক জমিদার বা তালুকদার—নায়েব বা এষ্টেটের ম্যানেজার, তুমি বড় প্রফেসার অধ্যাপক উকীল মোক্তার, তোমার ধন আছে ঐশ্বর্য্য আছে—সম্পত্তি আছে—তালুক আছে, টাকা আছে কড়ি আছে—সুতরাং তোমার আর ভয় কি? ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তোমার অখণ্ড মণ্ডলাকারং রজতখণ্ডের দাস, মনু যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস পরাশর রঘুনন্দন জিমূতবাহন মেধাতিথি মল্লিনাথ, স্মৃতি সংহিতা তোমার অমিত প্রতাপে অর্থের প্রলোভনে তটস্থ! আর আমি—আমি যে দীন হীন দরিদ্র দুর্ব্বল, যত বিধি-নিয়ম-ব্যবস্থা-প্রায়শ্চিত্ত সবই আমার জন্য। পান থেকে চুনটুকু খসিয়া গেলে আর আমার নিস্তার নাই—এক রাত্রির বৈঠকে সহস্র-খানা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। পরদিনই আমার হুঁকা কল্কে বন্ধ—আমি একঘরে! তুমি জমীদার অর্থশালী টোল করিয়া দিয়া—মাসিক ও বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সমাজপতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রতিপালন করিতেছ—সুতরাং সেই অনন্যগতি প্রতিপালিত পণ্ডিতগণ আর তোমার উপর কোন্ মনু—কোন্ রঘুনন্দন জারি করিবেন? এবম্বিধ-রূপে দুর্ব্বলের প্রতি যে জাতির প্রাধান্য বিস্তারে চেষ্টা ও বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে যে জাতির আগ্রহ, সে জাতির পতন হইবে না ত কোন্ জাতির পতন হইবে? দেশের জন্য, সমাজের জন্য সমগ্র জাতির জন্য যাঁহারা কর্ত্তব্যের গুরুভার মস্তকে ধারণ করিয়া, মাতৃভূমির শিরে জ্ঞান বিদ্যার বিজয়মুকুট পরিধান করাইয়া ধন্য হইবার আশায়—পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবগণের স্নেহের বন্ধন অশ্রুসিক্ত নয়নে সবলে ছিন্ন করিয়া—উত্তাল তরঙ্গ-

মালা বিক্ষুব্ধ সাগরাম্বু রাশির গভীর গর্জ্জনের মধ্য দিয়া অপরিচিত—বিদেশে উপনীত হইয়া বিদ্যাজ্ঞান অর্জ্জন পূর্ব্বক মাতৃভূমিকে—গৌরবান্বিতা করিয়া দেশে ফিরিয়া আইসেন—তাঁহাদিগকে আমরা কোল পাতিয়া বাহু প্রসারণ করিয়া সাদরে সাগ্রহে সমাজে টানিয়া লইবার পরিবর্ত্তে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছি—আর যাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া মদ্যপান ব্যভিচারে বারবণিতালয়ে অস্পর্শীয়াগণের স্পৃষ্ট তৈয়ারী খাদ্য আহার করিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে—সমাজের পবিত্র আদর্শ ধ্বংস করিতেছে—চক্ষের উপর কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া পরবর্ত্তী বংশধরগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে—তাহাদিগকে আমরা পরম সমাদরে সমাজপতি বলিয়া গ্রহণ করিতেছি ও তাহাদের আদেশ অবনত শিরে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছি। আমরা করিতেছি কি ! পুণ্যকে তাড়াইয়া দিয়া পাপকে ডাকিয়া আনিতেছি—ধর্ম্মকে বিদায় দিয়া অধর্ম্মকে গ্রহণ করিতেছি, লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষ্মীকে গৃহে তুলিতেছি, দেবতাকে ত্যাগ করিয়া দানবের পূজায় ব্রতী হইয়াছি ! সুতরাং এ দেশের পতন কি অনিবার্য্য নহে ? কিন্তু ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, দেশের জলবায়ুর পরিবর্ত্তন হইতেছে, দেশবাসী আপনাদের ভালমন্দ অকল্যাণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছে, দিন দিন নূতন নূতন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইতেছে। রঘুনন্দনকে রম্ভা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতি বৎসর দলে দলে শিক্ষিত যুবকগণ বিদেশে গমন করিতেছেন। আর যাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন—দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল ভবিষ্য-নেতা সমাজপতি যুবকদল তাঁহাদিগকে সাদরে হৃদয়মন্দিরে টানিয়া লইতেছেন। ইহা মঙ্গল-ময় বিধাতাপুরুষের অদৃষ্ট ইঙ্গিত—সমাজপতির কি সাধ্য, মানুষের কি সাধ্য ইহার গতি রোধ করিতে পারে। ইহাদের অপরাধ কি ? অপরাধ ত অখাদ্য খাওয়া ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণ ! আচ্ছা দেখা যাউক—এ অপরাধের শাস্ত্রে কি দণ্ডবিধান আছে। আর আমরাও এরূপ অপরাধে সম অপরাধী বা ইহাপেক্ষাও গুরুতর অপরাধী কি না ! বিলাতযাত্রীর অপরাধ

(১) অখাদ্য ভোজন—যথা (ক) গোমাংস, শূকর মাংস, মুরগী মাংস প্রভৃতি—(২) ম্লেচ্ছান্ন—ম্লেচ্ছ সংস্পৃষ্ট খাদ্য-গ্রহণ, (৩) শীতপ্রধান দেশে পানীয়াভাবে মদ্যপান। প্রথম ও তৃতীয় দোষ হইতে অধিকাংশ ভারতীয় ও বঙ্গীয় বিলাত জাপান বা আমেরিকা প্রত্যাগত যুবকই নির্ম্মুক্ত। তত্রাচ তর্কস্থলে ধরিয়া লইলাম ইহাঁরা ত্রিবিধ দোষেই দোষী—অপরাধী। এক্ষণে আমরা একে একে প্রত্যেক অপরাধ লইয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হই। প্রথমতঃ অখাদ্য-ভোজন—গো-মাংস শূকর মাংস বা মুরগী মাংস প্রভৃতি।

উশনঃ সংহিতা বলিতেছেনঃ—

শললঞ্চ বলাকঞ্চ হংসকারণ্ডবং তথা। ২৪
চক্রবাকঞ্চ জগ্ধা চ দ্বাদশাহমভোজনম্।
কপোতং টিট্টিভং ভাসং শুকং সারসমেবচ। ২৫
জলৌকং জল পাতঞ্চ জগ্ধা হ্যেতদ্‌ব্রতঞ্চরেৎ।
শিশুমারং তথা মাষং মৎস্যং মাংসং তথৈব চ। ২৬
জগ্ধাচৈব বরাহঞ্চ এতদেব ব্রতরেৎ।

(নবম অধ্যায়)

"শলল, বলাকা, হংস, কারণ্ডব অথবা চক্রবাক ভোজন করিলে দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। কপোত, টিট্টিভ, ভাস, শুক, সারস, জলৌক বা জালপাদ ভোজন করিলে এই ব্রত করিবে। শিশুমার, মাষ, মৎস্য অথবা বরাহ ভোজন করিলেও এই ব্রত করিবে।"

কপোতং কুঞ্জরং শিগ্রুং কুক্কুটং রজকাং তথা। ৩০
প্রাজাপত্যং চরেজ্জগ্ধা তথা কুম্ভীরমেব চ।

(উশনঃ সংহিতা, নবম অধ্যায়)

"কপোত, হস্তী, শজিনা, কুক্কুট, রজকা অথবা কুম্ভীর ভোজন করিলে প্রজাপত্য করিবে।"

বিষ্ণু সংহিতায় ভগবান বিষ্ণু বলিতেছেন—

* * * অন্ত্যতমস্য প্রাশনে চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ॥ ২॥

লশুন পলাণ্ডু গৃঞ্জনৈতদ্গন্ধিবিড়্‌বরাহ গ্রাম্য কুক্কুটবানর

গোমাংসভক্ষণে চ॥ ৩॥ * * * *—(একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ)

* * * * * "অন্ত্যতম ভোজনে চান্দ্রায়ণ করিবে। লশুন, পলাণ্ডু গৃঞ্জন, এতদ্গন্ধী (লশুনাদি গন্ধদ্রব্যযুক্ত) বিড়্‌বরাহ, গ্রাম্যকুক্কুট, বানর এবং গোমাংস ভোজনেও ঐ চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত।"

* * * খরোষ্ট্র কাক মাংসাশনে চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ। ২৬॥

প্রাণ্যজ্ঞাতং সূণাস্থং শুষ্কমাংসঞ্চ॥২৭॥

(৫১শ অধ্যায়—বিষ্ণুসংহিতা)

'খর মাংস, উষ্ট্রমাংস বা কাকমাংস ভোজন করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে। অজ্ঞাত মাংস, যাহা ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য এ বিষয় নিশ্চয়ই নাই—সেই পশু পক্ষী প্রভৃতির মাংস, বধস্থানস্থিতমাংস (কসাইখানার) ও শুষ্ক মাংস ভোজন করিলেও ঐ চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত।"

বার্ত্তাকুং তণ্ডুলীয়ঞ্চ প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি। ৩২

অলাবুং গৃঞ্জনঞ্চৈব ভুক্ত্বাপ্যেতদ্‌ব্রতং চরেৎ। ৩৩

(উশনঃ সংহিতা—নবম অধ্যায়)

"বার্ত্তাকু (শ্বেত বার্ত্তাকু, সাদা বেগুন) এবং তণ্ডুলীয় ভোজনে, অলাবু (লাউ), গৃঞ্জন (সম্ভবতঃ গাঁজর) ভোজন করিলে প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধি-লাভ করিবে।"

এক্ষণে ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। শাস্ত্রকার বলিতেছেন :—

বাপী-কূপ তড়াগানারামস্য সরঃস্রুচ।

নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥ ৩৭৩—অত্রিসংহিতা।

"যে নিঃশঙ্কভাবে কূপ, তড়াগ, সরোবর এবং আরাম স্থল রুদ্ধকরে—সেই ব্রাহ্মণ "ম্লেচ্ছ" বলিয়া কথিত হয়।" চণ্ডাল কিন্তু ম্লেচ্ছ অপেক্ষাও অধম জাতি। চণ্ডাল সর্ব্ব নিম্ন—সর্ব্বাপেক্ষা অধম জাতি। অত্রি পরবর্ত্তী শ্লোকে চণ্ডালের নিম্নলিখিত প্রকার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা :—

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিতঃ—
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে ॥ ৩৭৪

(অত্রি সংহিতা)

"ক্রিয়াহীন (সন্ধ্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মহীন), মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্মরহিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ "চণ্ডাল" বলিয়া গণ্য।

আর্য্যগণ ভারতেতর দেশকেই ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—সুতরাং তাহাদের (ম্লেচ্ছগণের) অন্নাদি আহারের তখন কোনই প্রয়োজন হয় নাই। ম্লেচ্ছদেশে গমনই শুধু নিষেধ করিয়াছেন। ম্লেচ্ছান্ন আহার সম্বন্ধে মনু অত্রি বিষ্ণু পরাশর ব্যাস গৌতম যাজ্ঞবল্ক্য উশনঃ অঙ্গিরা প্রভৃতি বিংশতি-খণ্ড সংহিতা গ্রন্থে প্রায় কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। নানা জাতির অন্ন পানীয় গ্রহণ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত ও বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। সেই জন্য ঠিক ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণের প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখ করিতে পারিলাম না। তবে চণ্ডালাদি তন্নিম্ন জাতির অন্ন গ্রহণের প্রায়শ্চিত্ত দেখিয়া ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণের অপরাধের পরিমাণ করিয়া লইতে পারিব। চণ্ডাল যখন ম্লেচ্ছ অপেক্ষাও হীন তখন চণ্ডাল অন্ন গ্রহণ যে ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণের অপেক্ষা অধিকতর অপরাধজনক হইবে তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। শাস্ত্রকার বলিলেও আমরা না হয় মানিয়া লইলাম চণ্ডাল—ম্লেচ্ছ অপেক্ষা হীন নহে সমান এবং চণ্ডাল অন্ন গ্রহণ ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণের তুল্য অপরাধজনক। এক্ষণে দেখা যাউক ম্লেচ্ছের সমান জাতি চণ্ডাল অন্ন গ্রহণ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার কি বলেন।

ব্রাহ্মণো জ্ঞানতো ভুঙ্‌ক্তে চণ্ডালান্নং কদাচন।
গোমূত্র যাবকাহারাদ্দশ রাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ৩০

(পরাশর সংহিতা ; ষষ্ঠ অধ্যায়।)

"ব্রাহ্মণ কখনও অজ্ঞান পূর্ব্বক চণ্ডালান্ন ভোজন করিলে দশরাত্রি গোমূত্র ও যাবক আহার করিয়া থাকিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। দশদিবসের প্রতি দিবসে গোমূত্র ও যাবকের এক এক গ্রাস ভক্ষণ করিয়া নিয়মানুসারে ব্রত পূর্ণ করিবে।"

পরাশর ঋষি পুনরায় বলিতেছেন ঃ—

অমেধ্যরেতো গোমাংসং চাণ্ডালান্নমথাপি বা।
যদি ভুক্তস্তু বিপ্রেণ কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ১

(একাদশ অধ্যায় ; পরাশর সংহিতা ॥)

"বিপ্র যদি অপবিত্ররেতঃ, গোমাংস কিংবা চণ্ডালান্ন ভোজন করেন তবে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবেন।'

তথৈব ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্তদর্দ্ধন্তু সমাচরেৎ।
শূদ্রোঽপ্যেবং যদা ভুঙ্‌ক্তে প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥২

সেই অবস্থায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহার অর্দ্ধেক ব্রত আচরণ করিবে। আর শূদ্র যদি উল্লিখিত দ্রব্য ভোজন করে, তবে তাহাকে প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিতে হইবে।"

অত্রি বলেনঃ—

চাণ্ডালান্নং যদা ভুঙ্‌ক্তে চাতুর্ব্বর্ণস্য নিষ্কৃতিঃ।
চান্দ্রায়ণং চরেদ্বিপ্রঃ ক্ষত্রঃ সান্তপনং চরেৎ ॥১৭২
ষড়্‌রাত্রমাচরেদ্বৈশ্যঃ পঞ্চগব্যং তথৈব চ।
ত্রি রাত্রমাচরেচ্ছূদ্রো দানং দত্ত্বা বিশুধ্যতি ॥১৭৩

(অত্রি সংহিতা।)

"চণ্ডালান্নভোজী চতুর্ব্বর্ণের বক্ষ্যমান প্রকারে শুদ্ধি, যথা—ব্রাহ্মণ—চান্দ্রায়ণ; ক্ষত্রিয়—সান্তপন; বৈশ্য—ষড়রাত্র ব্রত ও পঞ্চগব্য ভোজন; এবং শূদ্র—ত্রিরাত্র ব্রত করিয়া যৎ কিঞ্চিৎ দান করিলে শুদ্ধ হইবে।"

ভগবান বিষ্ণু বলিতেছেন :—

* * বেদনিন্দা ।৪। অধীতস্য চ ত্যাগঃ ।৫। অগ্নি মাতৃ পিতৃ সুত দারাণাঞ্চ ।৬। অভোজ্যান্ন ভক্ষ্য ভক্ষণম্ ।৭, পরস্বাপ-হরণম্ ।৮। পরদারাভিগমনম্ ।৯। অযাজ্য যাজনম্ ।১০। বিকর্ম্ম জীবনঞ্চ ।১১। অসৎ প্রতিগ্রহশ্চ ।১২। ক্ষত্রবিট্‌শূদ্র গোবধঃ ।১৩। অবিক্রেয় বিক্রয়ঃ ।১৪। * * * ভৃতকাধ্যাপনম্ । ২০। ভৃতাচ্চাধ্যয়নাদানম্। * দ্রুমগুল্মবল্লীলতৌষধীনাং হিংসা ।২৪। আত্মার্থে ক্রিয়ারম্ভঃ ।২৭। অনাহিতাগ্নিতা ।২৮। দেবর্ষি পিতৃঋণানামনপক্রিয়া ।২৯। * * কুশীলবতা ।৩২। ইত্যুপ পাতকানি ।৩৪। উপপাতকিন স্ত্বেতে কুর্য্যুশ্চান্দ্রায়ণং নরাঃ। পরাকঞ্চ তথা কুর্য্যুর্যজেয়ুর্গোমখেন বা ।৩৫

(৩৭শ অধ্যায়, বিষ্ণু সংহিতা।)

* * "বেদনিন্দা, অধীত বেদ বিস্মরণ, আহিত—অগ্নিত্যাগ, অপতিত মাতা-পিতা-পুত্র-পত্নীত্যাগ, অভোজ্যান্ন ভোজন (অর্থাৎ চাণ্ডালাদির অন্ন ভোজন), অভক্ষ্য ভক্ষণ (অর্থাৎ লশুনাদি ভক্ষণ), পরস্বাপহরণ, পর স্ত্রী গমন, অনুচিত কর্ম্ম (যথা—ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়াদির কর্ম্ম যুদ্ধাদি করা (দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য ও পরশুরাম ইহাঁদের উপায় কি ?) বৈশ্যাদির দোকানদারী, কুষিদ, বাণিজ্যাদি কিংবা শূদ্রের কার্য্য দাস্য কর্ম্ম (গোলামাদি কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করা), অসৎ প্রতিগ্রহ, শূদ্রের দানাদি গ্রহণ ক্ষত্রিয় হত্যা বৈশ্যহত্যা, শূদ্র হত্যা, গোহত্যা, অবিক্রেয় (অর্থাৎ লবণাদির) বিক্রয় প্রতিনিয়ত বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অধ্যাপনা, প্রতিনিয়ত বেতন দান পূর্ব্বক অধ্যয়ন, দ্রুম, গুল্ম, লতা এবং ঔষধির বিনাশন, দেবাদি উদ্দেশ না করিয়া কেবল আপনার জন্য পাকাদি অনুষ্ঠান, অধিকার থাকিতে অগ্নি—আধান না

না করা, দেবগণ, ঋষিগণ এবং পিতৃঋণ পরিশোধ না করা, নটবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ এই সকল উপপাতক। এই সকল উপপাতকী মনুষ্যবৃন্দ, চান্দ্রায়ণ অথবা পরাকব্রত করিবে, অথবা গোমেধ যজ্ঞ করিবে।" বিষ্ণু সংহিতা পুনর্ব্বার বলিতেছেন :—

চণ্ডালান্নং ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ॥৫৭॥ সিদ্ধং ভুক্ত্বা পরাকঃ ॥৫৮

(৫১শ অধ্যায়;)

"চণ্ডালের অর্থাৎ চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির অপক্ক অন্ন ভোজনে তিন দিন উপবাস করিবে, আর সিদ্ধান্ন ভোজন করিলে পরাকব্রত করিবে" অঙ্গিরঃ সংহিতা বলেন :—

অন্ত্যানামপি সিদ্ধান্নং ভক্ষয়িত্বা দ্বিজাতয়ঃ।
চান্দ্রং কৃচ্ছ্রং তদর্দ্ধন্তু ব্রহ্ম ক্ষত্রবিশাং বিদুঃ ॥২

(প্রথম অধ্যায়।)

"দ্বিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) চণ্ডালাদি নীচ জাতির সিদ্ধান্ন ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণের চান্দ্রায়ণ, ক্ষত্রিয়ের কৃচ্ছ্র এবং বৈশ্যের কৃচ্ছ্রার্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত ইহাই পণ্ডিতগণের সম্মত।" অত্রি পুনর্ব্বার বলিতেছেন :—

রজকঃ শৈলূষশ্চৈব বেণুকর্ম্মোপজীবনঃ।
এতেষাং যস্তু ভুঙ্‌ক্তে বৈ দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১৬৮
সংস্পৃষ্টং যস্তু পক্কান্নমন্ত্যজৈর্ব্বাপ্যুদক্যয়া।
অজ্ঞানাদ্ ব্রাহ্মণোঽশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যার্দ্ধমাচরেৎ ॥১৭১

"রজক শৈলূষ (নাটকাদিতে সাজিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে,) বেণু কর্ম্মোপজীবী (ডোম ইত্যাদিগের অন্ন ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ অন্ত্যজ বা রজস্বলা-স্পৃষ্ট পক্কান্ন ভোজন করিলে প্রাজাপত্যার্দ্ধ করিবে।"

অপিচ—

রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥১৯০
এষাং গত্বা স্ত্রিয়ো মোহাদ্ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
কৃচ্ছ্রাব্দমাচরেদজ্ঞানাদজ্ঞানাদৈন্দবদ্বয়ম্॥১৯৬

(অত্রি সংহিতা)

"রজক, চর্ম্মকার, নট (নাটক যাত্রা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহকারী), বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সাতটী জাতিকে অন্ত্যজ কহে। জ্ঞানপূর্ব্বক ইহাদিগের স্ত্রীগমন, অন্ন ভোজন বা প্রতিগ্রহ করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কৃচ্ছ্রাব্দ (একবৎসর একাধিক্রমে প্রাজাপত্যব্রত, ৩০ প্রাজাপত্য) করিতে হইবে; অজ্ঞানপূর্ব্বক করিলে চান্দ্রায়ণদ্বয়।"

"রজকব্যাধশৈলুষবেণু চর্ম্মোপজীবিনাম্।
ভুক্তৈষাং ব্রাহ্মণশ্চান্নং শুদ্ধিং চান্দ্রায়ণে ন তু॥৩১

নবম অধ্যায়; আপস্তম্বসংহিতা।

"রজক, ব্যাধ, শৈলুষ, বেণুজীবী এবং চর্ম্মকার ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণগণ চান্দ্রায়ণ করিবে।'

আপস্তম্ব পরে বলিতেছেন :—

রজক ব্যাধশৈলুষবেণু চর্ম্মোপজীবিনাম্।
যো ভুঙ্‌ক্তে ভক্তমেতাষাং প্রাজাপত্যং বিশোধনম্॥১২

দশম অধ্যায়, আপস্তম্ব সংহিতা।

"* * অন্ন ভোজনে প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে।' এতৎ সম্বন্ধে ব্যবস্থা শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ মনু সংহিতা কি বলেন দেখা যাউক :—

গোবধোঽযাজ্যসংযাজ্য পারদার্য্যাত্মবিক্রয়াঃ।
গুরুমাতৃপিতৃ ত্যাগঃ স্বাধ্যায়াগ্নোঃ সুতস্য চ॥৬০

* * * * বার্দ্ধ্যং * * *

ভৃতাচ্চাধ্যয়নাদানমপণ্যানাঞ্চ বিক্রয়ঃ ॥৬৩

সর্ব্বাকরেম্বধীকারো মহা যন্ত্র প্রবর্ত্তনম্।

হিংসৌষধীনাং স্ত্র্যাজীবোহভীচারো মূলকর্ম্ম চ ॥৬৪

ইন্ধনার্থমশুষ্কাণাং দ্রুমাণামব পাতনম্।

আত্মার্থঞ্চ ক্রিয়ারম্ভো নিন্দিতান্নাদনং তথা ॥৬৫

অনাহিতাগ্নিতা স্তেয় মৃণনামনপ ক্রিয়া।

অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনং কৌশীলব্যস্ত চ ক্রিয়া ॥৬৬

ধান্ত কুপ্য পশুস্তেয়ং মদ্যপস্ত্রীনিষেবণম্।

স্ত্রী শূদ্র বিট্ ক্ষত্রবধো নাস্তিক্যঞ্চোপপাতকম্॥ ৬৭

* * * * * *

এত দেব ব্রতং কুর্য্যুরুপপাতকিনো দ্বিজাঃ।

অবকীর্ণিবর্জ্জং শুদ্ধ্যর্থং চান্দ্রায়াণমথাপিবা॥ ১১৮

(একাদশ অধ্যায়)

"গো হত্যা, অযাজ্যযাজন (শূদ্রযাজন), পরস্ত্রীগমন, আত্মবিক্রয়, পিতা মাতা ও গুরুত্যাগ, স্বাধ্যায় ও স্মার্ত্তাগ্নিত্যাগ, * * * বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকা (সুদের টাকায় জীবন ধারণ) * * অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রয়, রাজাজ্ঞায় সুবর্ণাদি খনিতে কাজ করা, বৃহৎ সেতু প্রভৃতিতে কাজ করা, ওষধি নষ্ট করা, অভিচার দ্বারা অনিষ্ট করা, জ্বালানী কাষ্ঠের জন্ত অশুষ্ক বৃক্ষের ছেদন, দেব পিত্রাদির উদ্দেশ্ত নয়—পরন্তু আপনার জন্ত পাকানুষ্ঠান লশুনাদি নিন্দিত খাদ্যের ভক্ষণ, অগ্ন্যাধানের অকরণ সুবর্ণ ব্যতীত অপর দ্রব্যের চুরি; দেব, পিতৃ ও ঋষ্যাদি ঋণের অপরিশোধ, শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ অসৎ শাস্ত্রের আলোচনা, নৃত্য গীত বাদিত্রোপ সেবন, ধান্ত,

তাম্র ও লৌহাদি ধাতু এবং পশুচুরি, * স্ত্রী হত্যা, বৈশ্য হত্যা এবং নাস্তিকতা—এই সকলের প্রত্যেককে "উপপাতক" বলা যায়। * * *

"অবকীর্ণী ব্যতীত অপর উপপাতকী দ্বিজগণ আত্মশুদ্ধির জন্য এইরূপে গোবধ প্রায়শ্চিত্ত অথবা চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে।"

"লবণ উৎপন্ন করা, * * তিল ইক্ষু প্রভৃতি দ্রবমর্দ্দক যন্ত্র পরিচালিত করা, শূদ্রসেবা * * এ গুলিও উপপাতক। দণ্ড চান্দ্রায়ণ। (অনুবাদ ; যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)।

যাজকান্নং নবশ্রাদ্ধং সংগ্রহে চৈব ভোজনম্।
স্ত্রীণাং প্রথমগর্ভে চ ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥২২
ব্রহ্মৌদনে চ শ্রাদ্ধে চ সীমন্তোন্নয়নে তথা।
অন্নশ্রাদ্ধে মৃত শ্রাদ্ধে ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥২৩

(নবম অধ্যায় , আপস্তম্বসংহিতা)।

"বহু-যাজী কিংবা গ্রামযাজীর (শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ,—শূদ্রবহুল গ্রামযাজী পুরোহিত ব্রাহ্মণ, যাঁহাদের কথা পুস্তকের প্রথম ভাগে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—ইহাদিগকে শাস্ত্রকার পতিত বলিয়াছেন) অন্ন, আদ্য-শ্রাদ্ধের অন্ন, * * * ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। ব্রহ্মৌদন নব শ্রাদ্ধে * * * অন্ন শ্রাদ্ধে, আদ্যশ্রাদ্ধে ভোজনে চান্দ্রায়ণ করিবে।"

পাচকান্নংনব শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৯২, অত্রি সংহিতা

"পাচক (রাঁধুনী) ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজনে চান্দ্রায়ণ করিবে।"

শাস্ত্রকার বলিতেছেন :—হাঁস, কবুতর, মৎস্য, মাংস ও শূকর ভোজন তুল্য-অপরাধ। প্রায়শ্চিত্ত ১২ দিন উপবাস। পরে বলা হইতেছে—কবুতর ও কুক্কুট, সাদা বেগুন ও লাউভোজন তুল্য-অপরাধ। দণ্ড প্রাজপত্য প্রায়শ্চিত্ত। ভগবান বিষ্ণু বলিতেছেন :—লশুন, পেঁয়াজ, গাঁজর ও লশুনাদি গন্ধযুক্ত দ্রব্য—গ্রাম্য কুক্কুট, বিড় বরাহ, গোমাংস

ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য নিশ্চয় জানা যায় নাই এবং অজ্ঞাত মাংস, বধস্থানস্থিত (কসাই খানার) মাংস, শুষ্ক মাংস ভোজন করা তুল্য অপরাধ। দণ্ড—চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত। এই ত গেল অভক্ষ্য মাংসাদি ভোজনের দণ্ড। এক্ষণে চণ্ডালাদি নীচ নীচ জাতির অন্ন ভোজনে কি অপরাধ ও দণ্ড শ্রবণ করুন। ম্লেচ্ছাপেক্ষা উন্নত চণ্ডালাদি নীচ জাতির অন্ন ভোজন, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন, অধীত বেদ বিস্মরণ, লশুনাদি ভক্ষণ, পরদ্রব্য অপহরণ, পরস্ত্রীগমন, ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি, বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্য দোকানদারী প্রভৃতি, শূদ্রের কার্য্য দাসত্ব করা চাকরী করা গোলামী করা প্রভৃতি, ক্ষত্রিয় হত্যা, বৈশ্য হত্যা, শূদ্র হত্যা, স্ত্রী হত্যা, গো হত্যা, লবণাদির বিক্রয়, দ্রুম, গুল্ম, লতা বিনাশ করা, কৃষকের ওষধি নষ্ট করা, দেব পিত্রাদির উদ্দেশে নয় পরন্তু নিজের জন্য পাকানুষ্ঠান করা, দেবঋণ পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ পরিশোধ না করা, থিয়েটারের বা যাত্রার দলে থাকা, রজক ব্যাধ, ডোম, চামার বা মুচির অন্ন ভোজন, আদ্য শ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন, রাঁধুনি বামুনের অন্ন ভোজন শূদ্রযাজন, পিতা মাতা ও গুরুত্যাগ, টাকা ধার দিয়া তাহার সুদে জীবিকা নির্ব্বাহ করা, সোনার খনিতে বা বড় পুলে চাকরী করা, জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য তাজা গাছ কাটা, শূদ্র সেবা তুল্য অপরাধ। দণ্ড—ব্রাহ্মণের পক্ষে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত।

পাঠকগণ, এক্ষণে দেখুন বঙ্গের হিন্দু সমাজ কিরূপ শাস্ত্রানুসারে ও ধর্ম্মবিধি মানিয়া চলিতেছে। মুখে মুখে আর্য্যধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করিলে,—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিলে লাভ নাই। প্রবৃত্তি মার্গে সমাজ সাঁ সাঁ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—উদ্দাম বেগের সম্মুখে আর বাধা দিয়া রাখিবার ক্ষমতা সমাজপতির ত দূরের কথা বিধাতা পুরুষের পর্য্যন্ত বোধ হয় নাই। সমাজপতিগণ! সতর্ক হউন, আর ২৫ বৎসর। তাহা হইলে চেঁচা চেঁচি সব বন্ধ হইয়া যাইবে।

হিন্দু সমাজ, এখন দেখ দেখি তোমরা আমেরিকা ফ্রান্স জার্ম্মানি জাপান বা বিলাত যাত্রী অপেক্ষা কোনও অংশে নিরপরাধ কি না? তাঁহারা বিদেশে যাইয়া যাহা করিতেছেন—তোমরা বাড়ী বসিয়াই সে সমুদয় অপরাধ করিতেছ। অথচ তোমরা মিছামিছি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিরক্ষর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সরল বিশ্বাসী হিন্দুর মনে ধাঁধাঁ জন্মাইয়া, কুসংস্কার জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া হিন্দু সমাজের—হিন্দুজাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছ। ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণের বা নানাবিধ অভক্ষ্য ভক্ষণের অপরাধে যদি তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে হয়, তবে সে সব অপরাধে তোমরাও ত বাদ পড় না! তোমরাও ত তুল্য অপরাধী। তাঁহারা হয়ত একটা অপরাধ করিতেছেন—মাতৃভূমির কোটি কোটি স্বজাতীয়ের মঙ্গল অনুষ্ঠানের জন্য,—আর তোমরা করিতেছ—সেইরূপ শত শত অপরাধ, তা ও—বিনা কারণে ঘরে বসিয়া। সমাজ এ সব অত্যাচারই নীরবে সহ্য করিয়াছে—এতকাল। যে দেশের শতকরা ৯৫ জন লোক নিরক্ষর,—যে দেশের ৩১ কোটি লোকের মধ্যে সাড়ে উনত্রিশ কোটি লোক নিরক্ষর, সে দেশে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ভগবানের নাম লইয়া ফাঁকি দিয়া ভুল ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া কঠিন কার্য্য নহে। তোমাদের শাস্ত্রের বচনের জাড়ি জুড়ির কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর নয়,—স্মৃতি সংহিতার পাতরা পাতরি এখন গুটাইয়া লইয়া শিকায় তুলিয়া ফেল। বিংশ শতাব্দির কালের বন্যা নব জাগরণের—নূতন জীবনের, শিক্ষা দীক্ষার প্রবল স্রোত বহিয়াছে। তাড়াতাড়ি না করিলে সামলান ভার হইয়া উঠিবে। দেখিতে দেখিতে দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। তোমার টিকিতে হাত দিয়া ভাবিবার অবসর পর্য্যন্ত দিবে না। বাঁধ বাঁধ—স্মৃতি সংহিতা পুরাণ গল্প তাড়াতাড়ি বাঁধিয়া ফেল। ঐ শুন বেদান্তের গভীর গর্জ্জন। খেঁকশিয়ালের রব আর কতকাল তিষ্ঠিতে পারিবে। বেদান্ত কেশরী আসিয়াছেন—স্মৃতি সংহিতারূপী

খেঁকশিয়ালগণ এখন আপনাপন পলাইবার গর্ত্ত অনুসন্ধান করুন। আরও শাস্ত্র বচন শ্রবণের সাধ আছে না কি? যদি থাকে তবে শোন—

সুরাপান সম্বন্ধে তোমাদের স্মৃতিকারগণ সমস্বরে কি বলিতেছেন। মনু,—উশনঃ (১ম শ্লোক ৮ম অধ্যায়), বিষ্ণু (পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ১।২।৩।৪।৫) অত্রি (১৬৪ শ্লোক), যাজ্ঞবল্ক্য (২২৭—তৃতীয় অধ্যায়), গৌতম (দ্বাবিংশ অধ্যায়), বশিষ্ঠ (প্রথম অধ্যায়) প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিয়াছেন :—

ব্রহ্ম হত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥৫৫

(একাদশ অধ্যায়, মনুসংহিতা।)

"ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের সুবর্ণ হরণ, গুরু-পত্নীগমন, ও এই সকল পাপীর সহিত এক বৎসর পর্য্যন্ত সংসর্গ—এই পাঁচটীকে "মহা পাতক" বলে।"

আর তার প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ড?

সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ ॥৯১
গোমূত্র মগ্নিবর্ণং বা পিবেদুদকমেব বা।
পয়ো ঘৃতং বা মরণাদ্গোশাকৃদ্রসমেব বা ॥৯২

(একাদশ অধ্যায়, মনুসংহিতা)

"বাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জ্ঞানপূর্ব্বক সুরাপান করিলে, ঐ পাপ ক্ষয়ার্থ অগ্নিবর্ণ জলন্ত সুরাপান করিবে; ঐ সুরার দ্বারা শরীর একেবারে দগ্ধ হইলে পর তবে পাপের নিষ্কৃতি হয়। অথবা অগ্নিবর্ণ জলন্ত গোমূত্র বা জল দুগ্ধ ঘৃত বা গোময় জল যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ পান করিবে। এইরূপে মরিলেই উক্ত পাপের নিষ্কৃতি।"

গৌতম বলেন :—

সুরাপস্য ব্রাহ্মণস্যোষ্ণামাসিঞ্চেয়ুঃ সুরামাস্যে মৃতঃ শুধ্যেৎ।

(চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়, গৌতম সংহিতা)

"মদ্যপ ব্রাহ্মণের মুখে উষ্ণমদ্য নিক্ষেপ করিবে; তাহাতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে উহার পাপ ক্ষয় হয়।" প্রায় সমুদয় হিন্দুরই বিশ্বাস গোমাংস ভক্ষণ তুল্য আর পাপ নাই, কিন্তু শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, শাস্ত্রকারগণ গো-মাংস ভক্ষণ ও সুরাপান অপেক্ষা অল্প পাতকজনক বলিয়াছেন।

বিষ্ণু সংহিতায় লিখিত আছে :—

অভক্ষ্যেণ ব্রাহ্মণ দূষয়িতা ষোড়শ সুবর্ণান্ ॥১৭॥

জাত্যপহারিণাশতম্ ॥১৮॥ সুরয়া বধ্যঃ ॥১৯

(পঞ্চম অধ্যায়)

"অভক্ষ্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে দূষিত করিলে, ষোড়শ সুবর্ণ অর্থদণ্ড, জাতি-নাশক অভক্ষ্য গো-মাংসাদি দ্বারা দূষিত করিলে শত সুবর্ণ অর্থদণ্ড; আর সুরাদ্বারা দূষিত করিলে বধদণ্ড।" কিন্তু হায়! এই সুরা বিশ্ববিজয় করিয়াছে। রাজা, মহারাজা, জমিদার, তালুকদার, প্রফেসর, উকীল, মোক্তার, কবিরাজ, ডাক্তার, শিক্ষক হইতে আরম্ভ করিয়া গুরু পুরোহিত স্মার্ত্ত পণ্ডিত পর্য্যন্ত এই সুরাস্রোতে ভাসমান—নিমজ্জমান। এখানে দণ্ডের কথা প্রায়শ্চিত্তের কথাটী মাত্র নাই। মনু স্মৃতি এখানে কেঁচো প্রায়। যত হাম্বি তাম্বি বচন শ্লোক বিলাত ফেরতের পক্ষে, আহারাদি ও জলচল সম্বন্ধে। "জলচল" শুনিলেই প্রভুরা চমকিয়া উঠেন ও ঘোর কাল আগমনের স্বপ্ন দেখেন এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দাঁত খেমটী বাহির করেন।

লোকে রঘুনন্দন ও মনুকে রম্ভা প্রদর্শনপূর্ব্বক অনবরত বিচারালয়ে হলপ পড়িয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে। তাহাতে সমাজে উচ্য বাচ্য নাই—ধর্ম্ম গেল ধর্ম্ম গেল প্রভৃতি রব নাই কিন্তু শাস্ত্র বলিতেছে—

ব্রহ্মোজ্ঝতা বেদনিন্দা কৌটসাক্ষ্যং সুহৃদ্বধঃ।
গর্হিতানাদ্যয়োর্জগ্ধিঃ সুরাপান সমানি ষট্॥৫৭

(একাদশ অধ্যায় ; মনু সংহিতা)

"অনভ্যাস হেতু ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ বিস্মরণ, বেদ নিন্দা, সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা কথন, মিত্রবধ, লশুন প্রভৃতি গর্হিত ও বিষ্ঠা মূত্রাদি অখাদ্য দ্রব্যের ভোজন—এই ছয়টী সুরাপানের "সমান পাতক।" দণ্ড—ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ প্রাণদণ্ড।

অতঃপর আহারাদি সম্বন্ধে লঘুতর দণ্ডের ব্যবস্থা লিখিত হইতেছে।

* * * ভুক্ত্বা সপ্তরাত্রং পয়সা বর্ত্তেত ॥৭॥ তক্ষকান্নং কর্ম্মকর্ত্তুশ্চ ॥৮॥ বার্দ্ধুষিককদর্য্যদীক্ষিতবদ্ধনিগড়াভিশস্তষণ্ডানাঞ্চ ॥৯॥ পুংশ্চলী দাম্ভিক চিকিৎসকলুব্ধকক্রূরোগ্রোচ্ছিষ্টভোজিনাঞ্চ ॥১০॥ * * সুবর্ণকার সপত্ন পতীনাঞ্চ ॥১১॥ পিশুনানৃতবাদিক্ষতধর্ম্মাম্বরসবিক্রয়িনাঞ্চ ॥১২॥ শৈলূষতন্তুবায়কৃতঘ্ন রজকানাঞ্চ ॥১৩॥ কর্ম্মকারনিষাদরঙ্গাবতারিবেণশস্ত্র বিক্রয়িণাঞ্চ ॥১৪॥ শ্বজীবি-শৌণ্ডিকতৈলিকচৈলনির্নেজকানাঞ্চ ॥১৫॥ * * নার্চ্চিতং বৃথামাংসঞ্চ ॥২০॥

(বিষ্ণুসংহিতা ৫১শ অধ্যায়, মনু ৪র্থ অধ্যায়)

"তক্ষকের (ছুতারের) অন্ন, চর্ম্মকারের অন্ন, সুদ খোরের অন্ন, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, চিকিৎসাজীবী, লুব্ধক, ক্রূর, সুবর্ণকার (সেঁকরা), শত্রু, পতিত, পিশুন (অসাক্ষাতে পরনিন্দাকারী), মিথ্যাবাদী, ধর্ম্মভ্রষ্ট, সোমবিক্রয়ী, নট, তন্তুবায়, কৃতঘ্ন, রজক (ধোপা), কর্ম্মকার (কামার), নিষাদ (ব্যাধ) * বেণুজীবী, লৌহবিক্রয়ী, শ্বজীবী (কুকুরবৃত্তিধারী, চাকুরে, দাস গোলাম), শৌণ্ডিক (শুঁড়ী), তৈলিক (তৈলবিক্রয়কারী কলু) * * ইহাদের প্রত্যেকের অন্ন, অনর্চ্চিত (অনিবেদিত) অন্নাদি অথবা বৃথা মাংস ভোজন করিলেও সাত দিন দুগ্ধ আহারে জীবন ধারণ করিবে।"

শাস্ত্র আরও বলিতেছেন :—

রাজান্নং হরতে তেজঃ শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসম্। ২৯৮।

(মনু ২১৮, ৪র্থ অধ্যায় ; অত্রি সংহিতা)

"রাজার অন্ন তেজ—এবং শূদ্রান্ন ব্রাহ্মণ্য নষ্ট করে (সুতবাং অভোজ্য)। দণ্ড—প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত।

অধীত্য চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্ববিৎ।

নরেন্দ্র ভবনে ভুক্ত্বা বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥৩০০

"চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী, সর্ব্বশাস্ত্র মর্ম্মজ্ঞ (ব্রাহ্মণ) রাজার ভবনে ভোজন করিলে), বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।" ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর সভাপতি সুসঙ্গের ব্রাহ্মণ মহারাজা এবং রাজা শশিশেখরেশ্বর বাহাদুর কি বলেন? যাঁহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন—তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রকার কি কঠোর মন্তব্যই না প্রকাশ করিয়াছেন!

মনু আরও বলিতেছেন :—

রাজান্নং তেজ আদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসম্।

আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নাং যশশ্চর্ম্মাবকর্ত্তিনঃ ॥ ২১৮ ॥

কারুকান্নং প্রজাংহন্তি বলং নির্ণেজকস্ত চ।

গণান্নং গণিকান্নঞ্চ লোকেভ্যঃ পরিকৃন্ততি ॥ ২১৯ ॥

পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যাস্ত্বন্নমিন্দ্রিয়ম্।

বিষ্ঠা বার্দ্ধুষিকস্যান্নং শস্ত্রবিক্রয়িণো মলম্॥ ২২০

*　*　*　*

মত্যা ভুক্ত্বা চরেৎ কৃচ্ছ্রং রেতোবিন্মূত্রমেবচ ॥ ২২২

(চতুর্থ অধ্যায়)

"সুবর্ণকারের অন্ন ভোজনে আয়ু নষ্ট হয় এবং চর্ম্মকারের অন্ন ভোজনে খ্যাতি লোপ হয়। শিল্পকারের অন্ন ভোজন করিলে সন্তান নষ্ট হয়,

বস্ত্রাধাবকের অন্ন ভোজনে বল হানি করে ; মিলিত জনসমূহের (হোটেলাদির) অন্ন এবং বেশ্যার অন্ন ভোজন করিলে কর্ম্মান্তরার্জ্জিত স্বর্গাদি লোক হইতেও ভ্রষ্ট হইতে হয়। চিকিৎসকের (কবিরাজ মহাশয় ও ডাক্তার বাবুদের) অন্ন ভোজন পুঁজ সমান, অসতী স্ত্রীর অন্ন ভোজন শুক্র ভোজন তুল্য ; বৃদ্ধি উপজীবির অন্ন ভোজনে (সুদখোর মহাজন গণের অন্ন ভোজন) বিষ্ঠা ভোজনের সমান ও লৌহবিক্রয়ীর অন্ন ভোজন শ্লেষ্মা ভোজন তুল্য ঘৃণিত জানিবে। * * * ইহাদিগের মধ্যে যে কাহারও অন্ন জ্ঞানতঃ ভোজন করিলে কৃচ্ছ্র অর্থাৎ প্রাজাপত্য ব্রতের আচরণ করিতে হয় এবং রেত, বিষ্ঠা ও মূত্র ভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত।" এক্ষণে দোকানের বা শূদ্রদের চিড়া মুড়ি খাওয়ার সম্বন্ধে শাস্ত্রকারের অনুশাসন লেখা যাইতেছে।

শুষ্কমন্নমবিপ্রস্য ভুক্ত্বা সপ্তাহ মৃচ্ছতি। ৪৬

(অঙ্গিরঃ সংহিতা, ১ম অধ্যায়),

"ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণের (শূদ্রের) শুষ্কান্ন (চিপিটকাদি) ভোজন করিলে সপ্তাহ ব্রত করিবে।"

বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ যে সিদ্ধান্নকে চিরসাথী করিয়াছেন দেখা যাউক শাস্ত্রকার সে সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন :—

মনু বলিতেছেন :—

অভোজ্যমন্নং নাত্তব্যমাত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা

অজ্ঞান ভুক্তন্তূত্তার্ব্যং শোধ্যং বাপ্যাশুশোধনৈঃ ॥১৬১

(একাদশ অধ্যায়)

"আত্মশুদ্ধিকামী ব্যক্তির কদাচ প্রতিষিদ্ধ অন্ন (সিদ্ধান্ন) ভোজন করা উচিত নয়, প্রমাদ বশতঃ ঐরূপ অন্ন ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ বমি করিয়া ফেলিবে, যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে শীঘ্রই ব্রহ্মসুবর্চ্চলা নামক ওষধির ক্বথিত জল পান করিবে।"

ইহা হইতেছে প্রমাদ বশতঃ অজ্ঞানকৃত ভোজনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত। প্রতিদিনের ২ বেলার জ্ঞান কৃত অপ্রমাদ জনিত এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত পণ্ডিতমহাশয়গণ করিতেছেন কি? না, বিধি ব্যবস্থা আইন কানুন দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত সব শূদ্রের বেলায়। নিজেদের জন্য নহে।

অতঃপর অনাচরণীয় শূদ্রগণের জল পান সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

শাস্ত্রে বহু স্থানে শূদ্রস্পৃষ্ট জল পান সম্বন্ধে নিষেধ বিধি করা হইয়াছে—যথা :—

"যে ব্রহ্মচারী শূদ্র হস্ত আনীত অন্ন কিংবা পানীয় দ্রব্য ভোজন বা পান করে, সে এক অহোরাত্র উপবাস অন্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে"। (অনুবাদ, সংবর্ত্তসংহিতা, ৩০শ শ্লোক) অথবা।

"ব্রাহ্মণ অজ্ঞানপূর্ব্বক শূদ্রস্পৃষ্টজল পান করিলে স্নানান্তে পঞ্চগব্য পান পূর্ব্বক এক দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে।"

(অত্রিসংহিতা, অনুবাদ ২৪৮ শ্লোক)।

পাঠকগণ দেখিবেন—শাস্ত্রকার শূদ্রের জল অপানীয় লিখিয়াছেন কিন্তু রঘুনন্দন ইহার মধ্যে বেশ এক চাল চালিয়া লইয়াছেন। তিনি শত করা ৬ জন ব্রাহ্মণ বাদদিয়া ৯৪ জন বঙ্গীয় হিন্দু সন্তানকে শূদ্রও করিয়াছেন—জলও শতকরা ৪৮ জনেব পানীয় রাখিয়াছেন। অর্থাৎ 'ধরি মাছ না ছুই পানী।' একে বাবে সবশুদ্ধকে—৯৪ জনকে অচল, অনাচরণীয়, অপানীয় বলিলে তাহারাও মানিবে না, নিজেদেরও ও চলিবে না। তাই অর্দ্ধেকের মত গায়ে হাত বুলাইয়া—পৃষ্ঠদেশ চাপ্‌রাইয়া—হ য ব র ল একটা নূতন কিছু করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমুদয় ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে শূদ্রও করিলেন, জলও চালাইলেন এবং এক কালে সর্ব্বশুদ্ধ লোককে চটাইতেও হইল না। শতকরা ৪২ জনকে হাতে রাখিয়া তাহাদিগকে জলচলের অধিকার দিয়া অবশিষ্ট ৫৮ জনের প্রতি তাহাদিকের দ্বারাই পাশবিক অত্যাচারের সূচনা করিয়া দিয়া

হিন্দু জাতির সর্ব্বনাশ সাধন পূর্ব্বক শূদ্রবিদ্বেষের পুঞ্জীভূত পাপ লইয়া ধরা হইতে অপসৃত হইলেন—সঙ্গে সঙ্গে গৃহে গৃহে গৃহে ভাই ভাই এর মধ্যে ছুৎমার্গের” দারুণ ঘৃণার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। উহারই শোচনীয় ফল স্বরূপ আজ হিন্দুজাতি মরণোন্মুখ—ধ্বংসোন্মুখ।

শাস্ত্রকার শূদ্রমাত্রকেই অনাচরণীয়, অপানীয় করিয়াছেন। রঘুনন্দন অনাচরণীয় সমুদয় শূদ্রকে আচরণীয় বা পানীয় শূদ্র করেন নাই, অনধিকারীকে অধিকারী করেন নাই বরং সুবর্ণবণিক প্রমুখ সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত সর্ব্ববাদী সম্মত বৈশ্যজাতিগণকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তুলিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না তিনি দাবাইয়াই গিয়াছেন। অথবা ক্ষমতা ছিল কিন্তু বুদ্ধ গৌরাঙ্গের মত তাঁহার হৃদয়েব অত্যন্ত অভাব ছিল। তাই—তুলিবার পরিবর্ত্তে ফেলিয়া দিয়াছেন, গ্রহণের পরিবর্ত্তে বর্জ্জন করিয়াছেন, প্রেমের পরিবর্ত্তে ঘৃণা বিদ্বেষই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হাতে কল্যাণকারিণী শক্তি অনেকখানি ছিল কিন্তু উহা দ্বারা হিন্দু সমাজের কল্যাণ সাধনের পরিবর্ত্তে ধ্বংস সাধনই করিয়া গিয়াছেন। বালকের হস্তে লৌহ অস্ত্র দিলে যাহা সচরাচর হইয়া থাকে তাহাই হইয়াছে। বঙ্গদেশে অনাচরণীয় শূদ্রগণের স্পর্শিত দধি গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু শাস্ত্রকার তদীয় হীন অস্পৃশ্য অপানীয় শূদ্রগণের দধি ব্যবহারযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বলিয়া ব্যবস্থা দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

ঋষি অত্রি বলিতেছেন :—

দেব যাত্রা বিবাহেষু যজ্ঞ প্রকরণেষু চ।
উৎসবেষু চ সর্ব্বেষু স্পৃষ্টাস্পৃষ্টির্নবিদ্যতে ॥২৪৫
আবনালং তথা ক্ষীরং কন্দুকং দধি শক্তবঃ।
স্নেহপক্কঞ্চ তক্রঞ্চ শূদ্রস্যাপি ন দুষ্যতি ॥২৪৬

“দেব যাত্রা (দেব দর্শনার্থ গমন), বিবাহ, এবং সকল উৎসব সময়ে স্পর্শ দোষ নাই। আরনাল (কাঁজি, অম্লজল), দুগ্ধ, খই প্রভৃতি, দধি, শক্তু,

স্নেহপক্ক (তৈলাদি দ্বারা পক্ক) ও তক্র (ঘোল) শূদ্রকৃত হইলেও (তাহা ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণাদির) দোষ হইবে না।"

মনুও বলিয়াছেন :—

এধোদকং মূলফলমন্নমভ্যুদ্যতঞ্চ যৎ।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়ান্মধ্বথাভয় দক্ষিণাম্ ॥২৪৭

* * * *

শয্যাং গৃহান্ কুশান্ গন্ধানপঃ পুষ্পং মণীন্দধি।
ধানামৎস্যান্পয়োমাংসং শাকঞ্চৈব ন নির্ম্নুদেৎ ॥২৫০

(চতুর্থ অধ্যায়, মনুসংহিতা)

"কাষ্ঠ, **জল**, মূল, ফল ও খাদ্য—যাহা অযাচিত ভাবে আপনা—আপনি উপস্থিত হয়, এই সকল এবং মধু ও অভয়দান, সকলের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করা যায়।" শয্যা, গৃহ কুশ, কর্পূরাদি গন্ধ দ্রব্য, **জল**, পুষ্প, মণি, **দধি**, ধানা (ভৃষ্ট যব তণ্ডুল) মৎস্য, দুগ্ধ, মাংস ও শাক—এ সমুদায়ও অযাচিত ভাবে উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যান করিবে না।" উপরে এবং এখানে সর্ব্বজাতির জল চলের বিধি পাইতেছি। পাঠকগণ, লক্ষ্য করিবেন। তবে—শ্বপাক চণ্ডাল সম্বন্ধে ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ করা হইয়াছে।

যথাঃ—অত্রি সংহিতায় :—

শ্বপাক চণ্ডাল পরিগ্রহে তু
পীত্বা জলং পঞ্চগব্যেন শুদ্ধিঃ ॥২২৯

"শ্বপাক চণ্ডালাদি নীচজাতি স্পৃষ্ট জল পান করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে।" (আপস্তম্ব সংহিতায় ২য় অধ্যায় ২য় শ্লোকেও এই একই কথা বলিতেছেন)

আপাস্তম্বও বলিতেছেন :—

অন্যৈস্তু খানিতাঃ কূপস্তড়াগানি তথৈব চ।

এষু স্নাত্বাচ পীত্বাচ পঞ্চগব্যেন শুধ্যাতি ॥৫—(দ্বিতীয় অধ্যায়)

"অন্য কর্ত্তৃক কৃত কূপ, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ের জলে স্নান এবং তাহা পান করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে।" পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হওয়া আর তাদের ঘরে বাস করা সমান নহে কি ? একটা ধোকা দেওয়া হইয়াছে মাত্র। ছুঁৎমার্গী ব্রাহ্মণগণ "ছুঁৎমার্গের" দোহাই দিতে যাইয়া অনেক সময় পাগলামী প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। নতুবা যে তীর্থ ক্ষেত্রকে আচার্য্যগণ মহা মহা পাপী উদ্ধারণ বলিয়া, কোটি কোটি জন্মের পাপ, মলিনতা হরণকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যে তীর্থের পবিত্র রজঃস্পর্শে গো-বধ, ব্রহ্ম-বধ, মহা অশুচি, শ্বপাক চণ্ডাল পর্য্যন্ত শুচি শুদ্ধ মুক্ত বুদ্ধ হইয়া যায় সেই সুপবিত্র তীর্থ ভূমিকেও চণ্ডালাদি স্পর্শে অশুচি হয় বলিয়া সংহিতাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হায়। শুদ্ধ মুক্ত ঋষিগণের মানব প্রেম—জীব শিবে অভেদবুদ্ধি, অদ্বৈত জ্ঞান, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলার সার্থকতা সম্পাদন।

সংবর্ত্ত সংহিতার নামে বলা হইতেছে :—

অন্ত্যজৈঃ স্বীকৃতে তীর্থে তড়াগেষু নদীষু চ।

শুদ্ধতে পঞ্চগব্যেন পীত্বা তোয়মকামতঃ ॥১৮৩

"অন্ত্যজ জাতি কর্ত্তৃক অপবিত্রীকৃত যে সকল তীর্থ, পুষ্করিণী এবং নদী তাহার জল অজ্ঞান পূর্ব্বক পান করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে।" অন্ত্যজ স্পর্শে তীর্থ, নদী পর্য্যন্ত অপবিত্র ও অশুদ্ধ হইয়া যায়। তীর্থের ত মান ও মূল্য এই প্রকার বাড়াইয়াছেন। অন্যকে শুচি ও পবিত্র করা ত দূরে থাকুক তীর্থ নিজেই অপবিত্র হইয়া থাকেন—হীনের স্পর্শে। শূদ্রের অন্ন যে ঠেকিলেই ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ শাস্ত্রেই রহিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় রহিয়াছে :—

*   *   *   *

অদত্তান্যগ্নিহীনস্য নান্নমদ্যাদনাপদি ॥১৬০—(প্রথম অধ্যায়)

"অগ্নিহীন ব্যক্তির (অর্থাৎ যাহাদিগের শ্রৌতস্মার্ত্ত অগ্নিতে অধিকার নাই, তাহাদিগের—শূদ্রাদির) অন্ন আপৎকাল ব্যতীত ভোজন করিবে না।" অর্থাৎ আপৎকালে স্বচ্ছন্দে ভোজন করা যায়। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় হিন্দুর এমন আপৎকাল আর কখনই বা ঘটিয়াছে।

আপৎকালে তু বিপ্রেণ ভুক্তং শূদ্র গৃহে যদি।
মনস্তাপেন শুধ্যেত দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ ॥১৯
(একাদশ অধ্যায় ; ২০শ শ্লোক, ৮ম অধ্যায়, আপস্তম্ব।)

"যদি কোনরূপ আপদ্‌কালে বিপ্র শূদ্রগৃহে ভোজন করেন তবে তাহাতে তাঁহার মনস্তাপ জন্মিলেই শুদ্ধ হইবেন, অথবা শতবার গায়ত্রী জপ করিবেন।" আমাদের বঙ্গ দেশে আচরণীয় জাতি ভিন্ন অন্যের স্পৃষ্ট জল ও দধি ব্যবহার্য্য ও পানযোগ্য নহে। যত শাস্ত্র, বিধি ঐ জল টুকুর মধ্যে, যত দোষী ঐ জল দৈ টুকু লইয়া। অনাচরণীয় হিন্দু ত দূরের কথা—ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অনাচারী (?) মুসলমানগণেব দাইল সম্ভার দানের অশুচি দুগ্ধ ভাণ্ডে আনীত, অনেক সময় পচা পাগাড়ের—ডোবার ময়লা পানী মিশ্রিত দুগ্ধ ব্যবহাবে আমাদের বিন্দু মাত্রও আপত্তি নাই। মুসলমান দুগ্ধ বিক্রেতার অনেকের মুখে শুনিয়াছি—"দুধের ভাঁড়ে দাইল সম্ভাব দিলে সে দাইল খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু হয় বলিয়া আমরা মাঝে মাঝে উহাতে দাইল সম্ভার দিয়া থাকি। আর পানী দেওয়া (দুধে জল দেওয়া) সে ত আমাদের অভ্যস্ত কার্য্য! প্রতিদিন ত আর দুধ সমান হয় না,—কিন্তু আমাদের রোজ দেওয়ার দুধ সমানই দিতে হয়, কাজেই গঙ্গা মাইর আশ্রয় লওয়া ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর কি? তবে ঠাকুর মহাশয়! আমরা গোয়ালাদের মত বেশী জল দেই না। অল্প করিয়াই—যৎ-সামান্য দিই পরিমাণ ঠিক রাখিবার জন্য!" ইত্যাদি। স্বার্থান্ধ সমাজপতি।

এসবই তুমি দেখিতেছ কিন্তু তথাপি তুমি নীচ আর্য্যামী ছাড়িয়া মন মুখ এক করিতেছ না। মুসলমান ভাইগণের ত শুচিঅশুচি এঁটো বাচ বিচার নাই। তাহাদের দেহ বিছানা আসবাবপত্র কূপোদক সবই ত আমাদের পক্ষে ঘোর অশুচিজনক (!) সুতরাং কেমন করিয়া তাহাদের দোহন করা ভাড়ের দুধ শুচিবাই গ্রস্ত আমাদের চলিতে পারে বলিয়া দিবে কি? দুধ ও জল মিশ্রিত দুধ যদি চলে তবে শুধু জল চলে না কেন? কি তোমার বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে দেখাও দেখি? শাস্ত্র ছাড়া, বেদ তন্ত্র পুরাণ সংহিতা, পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রচলিত "সনাতন ধর্ম্ম" নিয়ম ছাড়া কোন কথা কোন যুক্তি শুনিতে চাওনা, জিজ্ঞাসা করি কোন্ শাস্ত্রের কোন্ পাতায় কোন্ শ্লোকে মুসলমানের দুধ গ্রহণ ও পানের ব্যবস্থা আছে? না—"ধরা পড়লে বৌএর মা, আর ফস্কিলেই চাচি!" ধিক কপটাচারী অনভিষিক্ত সমাজপতিকে—ধিক্ তোমাদের শাস্ত্র চর্চ্চা, বিদ্যা বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য উপাধিকে! ঐ ত শাস্ত্র বলিতেছেন:—

ভাণ্ডস্থিতমভোজেষু জলং দধি ঘৃতং পয়ং
অকামতস্তু যো ভুঙক্তেপ্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥ ২৪
ব্রহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রোবাপ্যুপসর্পতি।
ব্রহ্মকূর্চ্চোপবাসেন যথা বর্ণস্য নিষ্কৃতিঃ ॥ ২৫

(পরাশর সংহিতা, একাদশ অধ্যায়।)

"যাহার অন্নগ্রহণ বা জলপান করা যায় না, তাহার ভাণ্ডস্থ জল, দধি, ঘৃত বা দুগ্ধ যদি কেহ অজ্ঞানতঃ ভোজন করে, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইবে? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র যদি উক্ত পাতকের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা চাহেন, তবে বর্ণনানুসারে ব্রহ্মকূর্চ্চ ভোজন বা উপবাসের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিবাব বিধি দিতে হইবে।" (গোমূত্র, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও কুশজল ইহাই ব্রহ্মকূর্চ্চ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এই পঞ্চগব্য পবিত্র ও পাপ নাশকারক।)

অজ্ঞানতঃ ত দূরের কথা, সমাজপতিগণের ঢেলা ঢেলা দুই দুইটা চোখের সামনে সজ্ঞানেই এ সব চলিতেছে কিন্তু কৈ কাহাকেও ত গোবর চোনা খাইয়া শুদ্ধ হইতে দেখিতেছি না। বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের মতে ত ব্রাহ্মণ ৬ জন ছাড়া আর বাকি ৯৪ জনই শূদ্র এবং ব্রাহ্মণগণ ত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও অন্ন গ্রহণ করেন না। অথচ শাস্ত্রকার বলিতেছেন—যাহার হস্তে অন্ন আহার ও জল পান করা যায় না—তাহার ভাণ্ডস্থ জল দধি-দুগ্ধও গ্রহণ করা যাইবে না। এমতাবস্থায় মুসলমান বা অনাচরণীয় হিন্দু ত দূরের কথা—দধি দুগ্ধ ঘৃত ব্যবসায়ী বর্ত্তমান শূদ্র সংজ্ঞক ঘোষনন্দন এবং বৈদ্য কায়স্থ কর্ম্মকার কুম্ভকার তিলি তাম্বুলি বারৈ গন্ধবণিক প্রভৃতি আচরণীয় নবশায়কগণের দধি দুগ্ধ ঘৃতও ব্যবহার্য্য হইতে পারে না। কেন না ইহাদিগের কাহারও অন্ন ব্রাহ্মণগণ আহার করেন না।

সহৃদয় পাঠকগণ দেখিবেন—শাস্ত্রকার কি বলিয়াছেন আর আমরা কি করিতেছি। অথচ শত করা ৯৯ জন শাস্ত্র শাস্ত্র করিতেছেন ও শাস্ত্রের দোহাই দিতেছেন। শাস্ত্র গিয়াছে ব্যবস্থা গিয়াছে, ধর্ম্ম গিয়াছে, কর্ম্ম গিয়াছে, আচার গিয়াছে নিষ্ঠা গিয়াছে,—আছে কেবল "মুণ্ডমালার দাঁত খেম্‌টা," ছুৎমার্গ, 'ধর্ম্ম গেল ধর্ম্ম গেল' রব। ধর্ম্ম কি আর ভারতে আছে—? যে দিন মাতৃঘাতী নরশোণিত পিপাসু ব্রাহ্মণ অবতার পরশুরাম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ডুবাইয়া দিয়া ব্যক্তিগত হিংসা বিদ্বেষ ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতমাতার সুশীতল বক্ষ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষক, গো বিপ্র প্রতিপালক, লক্ষ লক্ষ ক্ষত্রিয় সন্তানের তপ্ত রুধিরে তর্পণ করিয়াছেন, যে দিন কুরুক্ষেত্রের কাল সমরে ভ্রাতৃবিরোধ যজ্ঞে সমগ্র ভারতের ক্ষত্রিয়কুল নিমন্ত্রিত হইয়া আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছেন,—সেই দিনই ভারতের ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনা পুণ্য যাহা কিছু ছিল, চিরনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। ধর্ম্ম আর নাই—আছে কেবল উহার কঙ্কাল মাত্র—খোসা ভুঁসি,—নারিকেলের

বাহ্য ছোবড়া বাহিরের আবরণ। ধর্ম্ম থাকিলে—দ্বাবিংশতি কোটি মানব সন্তান—হিন্দু সন্তান এমন পশুর মত হীন ভাবে জীবন যাপন করিত কি? "একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়—একদা যাহার অর্ণব পোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়—সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ" তাহারাই আজ কিনা সমুদ্র যাত্রার নামে শিহরিয়া উঠে, দাঁত শিট্‌কায়—আর ধর্ম্ম গেল ধর্ম্ম গেল বলিয়া চেঁচায়? অদৃষ্টের এমন উপহাস আর কেহ কখন দেখিয়াছে কি? "হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় আর কোন ধর্ম্মই এত উচ্চতানে মানব আত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দু ধর্ম্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরিব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম্মও এরূপ করে না। ভগবান্ আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্ম্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড "পারমার্থিক ও ব্যবহারিক" নামক মত দ্বারা সর্ব্বপ্রকার আসুরিক অত্যাচারের যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।" (১) "ধর্ম্ম কি ভারতে আছে? এখন ধর্ম্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁওনা আমায় ছুঁওনা এই ভাব,—দুনিয়া মহা অপবিত্র—কেবল আমি ও আমরাই পবিত্র। জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ কর্ম্মমার্গ সব পলায়িত, এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁওনা—আমায় ছুঁওনা; হিন্দুর ব্রহ্ম এখন ব্রহ্মলোকেও নাই—গোলকেও নাই—যোগী মুনি ঋষিগণের হৃদয় কন্দরেও নাই—যাগ যজ্ঞ উপাসনা তপস্যাতেও নাই—ব্রহ্ম এখন রান্নাঘরে—ব্রহ্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে"। (২) 'রান্নাঘরে ঢুকিলেই, ভাতের হাঁড়ি স্পর্শ করিলেই ব্রহ্ম ওলট পালট, হ্যাঁকচ্ প্যাঁকচ্! হায়! হিন্দু সমাজ! তোমার কি না অধঃপতনই ঘটিয়াছে। প্রতিপদ-বিক্ষেপে তোমার জাতি যাইবার আশঙ্কা'। যবন ম্লেচ্ছের পদাঘাতে

(১) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত "পত্রাবলী"।

হাজার বৎসরের দাসত্বে—গোলামীতে পা-চাটায় যাহাদের জাতি যায় নাই—তাহাদের জাতি এত সহজে, একটু জল পানে—যায় কেমন করিয়া বুঝিতে পারি না। বিধি ব্যবস্থার দৃঢ় বন্ধনে এ জাতির উত্থান শক্তি গতপ্রায় হইয়াছে। "বন্ধন খোল—বন্ধন খোল—জীবের যতদূর সাধ্য বন্ধন খোল, কাদা দিয়ে কি ধোয়া যায়? বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে—মুক্তি লাভ করা যায়?' (২) চীনাগণ যেমন একটি প্রাচীর নির্ম্মাণ দ্বারা সমুদয় উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়াছিল, আমরাও সেইরূপ বিধি ব্যবস্থার দৃঢ় প্রাচীরে আবদ্ধ হইয়া অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি। কূপের ব্যাঙ যেমন মনে করে তাহার কূপই সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এ ছাড়া জগৎই নাই—এর নিকট সাগর মহাসাগর দাঁড়াইতেই পারে না—আমরাও তদ্রূপ আমাদের নীচ আর্য্যামীর ক্ষুদ্র কূপে আবদ্ধ থাকিয়া ইহাকেই সারা বিশ্ব বলিয়া মনে করিতেছি—এবং আনন্দে আটখানা হইয়া কতই আবোল তাবোল বকিতেছি। শাস্ত্রে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এতই বিধি নিয়ম লিপি বদ্ধ হইয়াছে যাহা পালন করিতে মানুষ ত দূরে থাকুক মুনিগণও অসমর্থ। এই বিধি নিষেধের বেড়া জালে, হিন্দু জাতি আচ্ছন্ন। আবার বলি খুলে দাও বন্ধন—জাতিটা একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচুক। সমাজের নিকট ব্যক্তির—নিয়মের ও শিক্ষার শাসন দ্বারা চির দাসত্বের ও বলপূর্ব্বক আত্ম বিসর্জ্জনের কি ফল ও পরিণাম, আমাদের মাতৃভূমিই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এ দেশে লোকে শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে জন্মায়, ভোজন পানাদি আজীবন নিয়মানুসারে করে, বিবাহাদিও সেই প্রকার; এমন কি মরিবার সময়ও সেই সকল শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে প্রাণত্যাগ করে। এ কঠোর শিক্ষায় একটি মহৎগুণ আছে, আর সকলই দোষ। গুণটী এই যে দুটী একটী কার্য্য পুরুষানুক্রমে প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া অতি অল্পায়াসে সুন্দর

(২) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত "পত্রাবলী"।

রকমে লোকে করিতে পারে। * * * কিন্তু এই সমস্তগুলিই প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হইয়া মনুষ্যে করে; তাতে মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, আশার তরঙ্গ নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্র সুখানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনী শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিসের আদর নাই। এ হৃদয়াকাশের মেঘ কখন কাটে না, প্রাতঃ সূর্য্যের উজ্জ্বল ছবি কখনও মনকে মুগ্ধ করে না। এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কি না, মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।

"নিয়মে চলিতে পারিলেই যদি ভাল হয়, পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে সমাগত রীতিনীতির অখণ্ড অনুসরণ করাই যদি ধর্ম্ম হয়, বল, বৃক্ষের অপেক্ষা ধার্ম্মিক কে? রেলের গাড়ীর চেয়ে ভক্ত সাধু কে? প্রস্তর খণ্ডকে কে কবে প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিতে দেখিয়াছে? গো মহিষাদিকে কে কবে পাপ করিতে দেখিয়াছ? অতি প্রকাণ্ড কলের জাহাজ, মহাবলবান্ রেলের ইঞ্জিন,—তাহা ও জড়; চলে ফেরে, ধাবমান হয়, কিন্তু জড়। আর ঐ যে ক্ষুদ্র কীটানুটী রেলের গাড়ীর পথ হইতে আত্ম রক্ষার জন্য সরিয়া গেল, ওটী চৈতন্যশালী কেন? যন্ত্রে ইচ্ছা শক্তির বিকাশ নাই, যন্ত্র নিয়মকে অতিক্রম করিতে চায় না, কীটটী নিয়মকে বাধা দিতে চায়, পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিপক্ষে উত্থিত হয় তাই সে চেতন। এই ইচ্ছা শক্তির যে খানে যত সকল বিকাশ, সেখানে সুখ তত অধিক, সে জীব তত বড। * * * চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা, চৈতন্য শক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর। আর মৃৎপিণ্ড প্রায়, প্রাণহীন যন্ত্র গুলির মত, উপল রাশির ন্যায় রাশীকৃত মনুষ্য সমষ্টির দ্বারা যে সমাজ গঠিত

হয়, সে কি সমাজ? তাহার কল্যাণ কে চায়? কল্যাণ যদি সম্ভব হইত, তবে সহস্র বৎসরের দাস না হইয়া আমরাই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ জাতি হইতাম, মহা মূর্খতার আকর না হইয়া ভারত ভূমিই বিদ্যার চির প্রস্রবণ হইত।"

"* * * দুষ্ট পুরুত গুলোর সমাজের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে অত গায়ে পড়ে বিধান দেওয়ার কি দরকার ছিল? তাইতেই ত লক্ষ লক্ষ মানুষ এমন কষ্ট পাচ্ছে!" (১)

"* * * স্বাধীনতা না দিলে কোনওরূপ উন্নতিই সম্ভব পর নহে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ধর্ম্ম চিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, তাহাতেই আমাদের এই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সমাজের পায়ে অতি গুরু শৃঙ্খল পরাইলেন। আমাদের সমাজ, দু'চার কথায় বলিতে গেলে, ভয়াবহ পৈশাচিকতা পূর্ণ। পাশ্চাত্য দেশে সমাজ চিরকাল স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছে। মানুষের * * উন্নতির মুখ্য সহায়—স্বাধীনতা। যেমন চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ, তাহার **খাওয়া দাওয়া**, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়।

"আমরা মূর্খের ন্যায় বাহ্য সভ্যতার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতেছি। না করিবই বা কেন? আঙ্গুর হাত বাড়াইয়া না পাইলে উহাকে টক বলিব না ত আর কি! ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ নর-নারীর অধিক যথার্থ ধার্ম্মিক লোক নাই, ইহা মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে ও না খাইয়া মরিতে হইবে! কেন একজন লোকও না খাইয়া মরিবে? * * ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পুরোহিতের দলকে

(১) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত "পত্রাবলী" ১ম ভাগ।

এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলাণ্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে। * * * পৌরিহিত্য, সামাজিক অত্যাচার এক বিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় ও উন্নতি করিবার আরও স্থবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে। * * এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে, এই ধর্ম্মই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। * ভারতের ধর্ম্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মত করিতে পার ? আমার বিশ্বাস, ইহা কার্য্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।” (১) পাশ্চাত্য শিক্ষার—পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে সমাজ তর তর বেগে ছুটীয়াছে। কার সাধ্য ইহার গতি রোধ করে। কোন্ যুগে কোন্ কালে ব্রাহ্মণ রাজা ও মহারাজা “ব্রাহ্মণ মহা সম্মিলন” স্থাপন করিয়া নিজেরা সেই সভার সভাপতির আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষায় যত্নবান ছিলেন ! ইহা কি পাশ্চাত্য ধন মাহাত্ম্য নহে ? ব্রহ্মণ্য গৌরব ত্যাগের মহিমা লুপ্ত হইয়া ধনের বিজয় বৈজয়ন্তি পতাকা উড্ডীয়মান হইল না কি ? পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব আরও কি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে ? পাশ্চত্য শিক্ষা সমাজের অভ্যন্তরে ঘুণ ধরাইয়া দিয়াছে, বাহিরের প্রলেপে—উত্তপ্ত বক্তৃতায়, উচ্চ নিনাদে, সভা সমিতিতে ইহার গতিরোধ করিতে পারিতেছ না। দাও—দাও যত সত্বর সম্ভব অধিকার দাও। এখন অধিকার না দিলে অধিকার কাড়িয়া লইবে, তাহার পরিণাম কখনও তোমাদের পক্ষে মঙ্গল হইবে না। “জল চল ও অন্ন রন্ধনের” অধিকার ত সামান্ত কথা ইহার পর তোমাদের বড় সাধের সভা সমিতির—বক্তৃতার খবরের কাগজের (কেন না ঋষিত্ব এখন এই সমস্ত দ্বারাই দর্শিত হইতেছে)

(১) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত “পত্রাবলী” ১ম ভাগ।

ঋষিত্ব ও ব্রাহ্মণ্য পর্য্যন্ত বল-পূর্ব্বক অধিকৃত ও লুষ্ঠিত হইবে। ভারত আর এখন শুধু ব্রাহ্মণের ভারত নাই, ভারত এখন আচণ্ডালের ভারত।

ভারতের জাত্যভিমানী উচ্চবর্ণের লোকেরা স্বদেশের ৫ কোটি লোককে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে। মনুষ্যের স্পর্শকে ইহারা যত অশুচি মনে করে কুকুর বিড়ালের স্পর্শকেও তেমন মনে করে না। অভিমানীরা যাহা-দিগকে অস্পৃশ্য মনে করে তাহাদের ছায়াপাতেই তাহাদের অন্নজল অশুদ্ধ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে মানুষ মানুষকে এমনই ঘৃণা করে, মানুষের মনুষ্যত্ব এই দেশে এমনই লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইতেছে।

যে দেশে মানুষের প্রতি মানুষের এমন ঘৃণা রহিয়াছে সেই দেশ কিরূপে আত্ম প্রতিষ্ঠ ও স্বাধীন হইবে?

ভারতের কল্যাণকামী মহাত্মারা বহুকাল ধরিয়া বলিতেছেন,—"জাতিভেদ, উচ্চ নিম্ন বর্ণের বিভেদ রাজনৈতিক দাসত্বের প্রধান কারণ।" তোমরা তোমাদের স্বদেশবাসী ভাইকে হাত ধরিয়া এক সঙ্গে দাঁড়াইতে পারিবে না, তবে কিরূপে সমষ্টির বল অনুভব করিবে? ভারত সন্তানগণ ভারত-বর্ষকে কস্মিন কালেও সমবেত কণ্ঠে "মা" বলিয়া ডাকে নাই, ইহাই ভারত-বর্ষের রাজনৈতিক অধঃপতনের ইতিহাসের শিরো-ভাগে লিখিত রহিয়াছে।

ভারতের স্বরাজ আন্দোলন যাঁহারা সার্থক করিয়া তুলিতে চাহেন তাঁহারা ইহা নিসংশয়ে জানিবেন যে ভারতবর্ষে জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বহু শতাব্দী যাবৎ যে ব্যবধান রচিত হইয়া আছে, তাহা দূর না করিলে এই দেশের রাজ নৈতিক মুক্তি সম্ভবপর হইবে না।

বড়ই সুখের বিষয় ছত্রপতি শিবাজীর সুযোগ্য বংশধর কোলাপুরের মহা-রাজ বাহাদুর ভারতীয় অবনত সম্প্রদায় সমূহের উন্নতি বিধানে আন্তরিক প্রচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার সভাপতিত্বে গত ৩০শে মে নাগপুরে এক নিখিল ভারতীয় কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, মধ্য

প্রদেশ ও বেরা‍ারের সকল স্থল হইতে দলে দলে প্রতিনিধিগণ এই সভায় উপস্থিত হইয়া ছিলেন। মারাঠা মহিলারা সাগ্রহে এই সভায় যোগদান করিয়া সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

সভাপতির বক্তৃতা।

সভাপতি কোলাপুরের মহারাজা বাহাদুর সুদৃঢ় ভাবে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাঁহার উদারতা ব্যঞ্জক বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পুনঃ পুনঃ উল্লাস ধ্বনি করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম আমরা ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি।

অন্যায় বোধ।

সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতার পরে বহু বক্তা এই সভায় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছেন। এই সকল বক্তৃতার মধ্যে একটি বিষয় অতি সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছিল। উচ্চ বর্ণের লোকগণ যে শতাব্দীর পর শতাব্দী নিম্ন বর্ণের লোকদের উপর দুর্ব্যবহার করিতেছে, সেই অন্যায় বোধ বক্তা ও শ্রোতা সকলের বাক্যে ও মুখমণ্ডলে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল। এক বক্তা বলিয়াছেন,—

উচ্চ বর্ণের লোকগণ যদি যুক্তির প্রতি কর্ণপাত না করেন, তাঁহারা যদি এখনও অবনত জাতির লোক সমূহকে আপনাদের লোক বলিয়া গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে এখন বহু দিনের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ লওয়া আবশ্যক। ব্রাহ্মণদিগকেই এখন অস্পৃশ্য করিয়া রাখা উচিত। এতকাল ব্রাহ্মণেরা যাহাদিগকে কুকুরের অধম মনে করিয়াছেন, যাহাদের স্পর্শে তাঁহারা আপনাদিগকে অশুচি মনে করিয়াছেন এখন সেই দুর্ব্যবহারের ক্ষোভ তাহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এমন অবস্থায় সমগ্র দেশের শান্তি ও উন্নতির জন্য উন্নত অবনত সকল সম্প্রদায়ের লোকের সামাজিক সম্মিলনের পরিপন্থী বিধি সকল রহিত করা আবশ্যক।

মানুষ কি কুকুরেরও অধম ?

কনফারেন্সে এক বক্তা বলিয়াছেন ;—এক শিক্ষা পরিষদে যোগ দিবার জন্ত দুইজন শিক্ষক পূর্ব্ববর্ত্তী সভাস্থলে যাইতেছিলেন। শিক্ষক দ্বয়ের এক জন উচ্চ বর্ণের, অন্য জন অবনত শ্রেণীর। মধ্যাহ্ন কালে তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতে ছিলেন। তৃষ্ণার্ত্ত শিক্ষক দ্বয়ের জলপানের দরকার হয়। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক নিকটবর্ত্তী জলাশয়ের সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া জলপান করিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি অস্পৃশ্ত তাঁহারত পুষ্করিণী স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। তাঁহার সম্মুখ দিয়া এক কুকুর সোপান অতিক্রম করিয়া নিম্নে গমন করিয়া জলপান করিয়া আসিল, তথাপি তিনি যাইতে পারিলেন না ? তিনি লোকের প্রতীক্ষায় তৃষ্ণার জ্বালা সহ্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে এক সহৃদয় "ব্যক্তি" তাহাকে জল তুলিয়া দিল। তিনি তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।

এক চর্ম্মকারের বক্তৃতা।

বোম্বাইর এক চর্ম্মকার এই সভায় আবেগময়ী বক্তৃতাদ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন। মিঃ টিলক সম্পাদিত কেশরী পত্রিকা হইতে বচন উদ্ধার করিয়া তিনি বলেন :—মিঃ টিলক ও তাঁহার দলভূক্ত লোক ভারতবর্ষের জন্ত স্বাভিলাস শাসন দাবী করিতেছেন, সোপান পরম্পরায় স্বায়ত্ত শাসন লাভের জন্ত যে আইন প্রণীত হইয়াছে তাঁহারা উহার বিঘ্ন ঘটাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এইরূপে যাঁহারা স্বাধীনতার দাবী করেন তাঁহারাই আপনাদের অন্তায্য অধিকার অক্ষুন্ন রাখিবার জন্ত অসংখ্য স্বদেশীয়কে চির দাসত্বে নিযুক্ত রাখিবার অভিপ্রায়ে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছেন।

ন্তাসন্তালিষ্ট দল।

নাগপুরের ন্তাসন্তালিষ্টদের এক প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত হইয়া

বলিয়াছেন ;—"অবনত সম্প্রদায়ের লোকগণের দুর্গতির মূলে ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের অক্ষমতা দৃষ্ট হইবে। গবর্ণমেণ্টেরও এই ক্ষেত্রে অপরাধ আছে। তাঁহারা শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিলে ইহাদের দুর্গতি দূর হইত। পরলোকগত গোখলে এই চেষ্টা করিয়াছিলেন।" এই বক্তা যাহা বলিয়াছেন উহা শ্রবণ করিয়া শ্রোতারা বারংবার তাহাকে ধিক্কার করিয়াছেন। কোন্ পূর্ব্ব পুরুষের কি অক্ষমতা বা পাপ ছিল, যাহার জন্ম তাহার বংশধরগণ অকারণে অনন্তকাল লাঞ্ছিত হইবে? বক্তা ইহার কোন সন্তোষ জনক উত্তর দিতে পারেন নাই।

সার বিপিন কৃষ্ণ বসু।

সার বিপিন কৃষ্ণ বসু বলেন,—এই কন্‌ফারেন্স সকল সম্প্রদায় মধ্যে ব্যবহারগত যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। উহাতে আমার বিশেষ সহানুভূতি আছে। অতীতের কথা বিস্মৃত হইয়া এখন আমাদিগকে সকলকে তুল্য ভাবে শ্রদ্ধা প্রীতি দেখাইতে হইবে। সমাজে একদল লোক অন্য দলকে পদদলিত করিয়া রাখিবে এমন কোন নৈতিক বিধি থাকিতে পারে না। সমাজে এক্ষণে যে অনর্থক ভেদ আছে উহারই ফলে হিন্দু সমাজ দিন দিন ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। অপমানিত ও লাঞ্ছিতেরা সমাজ নিগ্রহ সহিতে না পারিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে। আমরা রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাভিলাষ শাসন দাবী করি, সমাজেও সেই স্বাভিলাষ নীতি গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে সকল সামাজিক-বিধি সম্প্রদায় সমূহ মধ্যে ব্যবধান রচনা করিয়া রাখিয়াছে এক্ষণে আমাদিগকে সেইগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। যাহারা অবনত বলিয়া অবজ্ঞাত হইতেছে তাহারা আমাদেরই ভাই। এক রক্ত এক মাংস। তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্ম আমাদিগকে প্রথমে বাহু প্রসারণ করিতে হইবে।

নিন্দা অঙ্গের অলঙ্কার।

অবনত জাতির উন্নতি বিধানে কোলাপুরের মহারাজা বাহাদুর প্রচেষ্ট হওয়ায় অনেক দাম্ভিক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাঁহার নিন্দা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইরূপ বহু বিজ্ঞাপন মহারাজা বাহাদুরের হস্তগত হইয়াছে। তিনি কন্‌ফারেন্সের উপসংহারে যে বক্তৃতা করিয়াছেন উহাতে তিনি বলিয়াছেন, আমি এই নিন্দার ভয়ে ভীত হইয়া কদাচ কল্যাণকর আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হইব না। কন্‌ফারেন্স ভাণ্ডারে মহারাজা বাহাদুর ৫ হাজার টাকা চাঁদা দিয়াছেন। ভারতের অবনত জাতি—সঞ্জীবনী।

অমৃতসহরের কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর অভিভাষণের মন্তব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি দেখিলাম—ধনিক এবং শ্রমিকের বিবাদের ফলে ইউরোপ এখন ছিন্ন ভিন্ন—শ্রমজীবীরা সেখানে ক্রমে প্রবল হইতেছে, অভিজাত সম্প্রদায়ের শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। হইতে পারে যখন আমরা স্বায়ত্বশাসন পাইব, তখন পূর্ব্ব পশ্চিমের "নীর" বাদ দিয়া ক্ষীর টুকু লইয়া আমরা নূতন শাসনপ্রাণালী প্রবর্ত্তিত করিব। আসুন, এই অবসরে আমরা পশ্চিমের ত্রুটীগুলি কি তাহা স্থির করি ও এ দেশের বদ্ধমূল কুপ্রথা ও মিথ্যা ধারণা সমূলে উৎপাটিত করি। আমাদের আদর্শ ভারত এমন হইবে যেখানে সকলে স্বাধীন রহিবে, যেখানে সকলে আত্মোন্নতির সমান সুবিধা পাইবে, যেখানে নারীজাতি দাসত্ব হইতে মুক্ত থাকিবে, যেখানে জাতিভেদের কঠোর অত্যাচারনিগড় থাকিবে না, যেখানে বিশেষ অনুগৃহীত কোন শ্রেণী অথবা সম্প্রদায় থাকিবে না, যেখানে সকলে বিনাবেতনে শিক্ষা পাইবে, যেখানে ব্রাহ্মণ চর্ম্মকার নির্ব্বিশেষে সকলে শিক্ষার আলোক পাইবে, যেখানে ধনিক এবং ভূস্বামী শ্রমজীবী ও রায়তকে অত্যাচারপিষ্ট করিবে না, যেখানে শ্রমিক দিগকে সকলে সম্মানের চক্ষে দেখিবে এবং তাহারা যথেষ্ট পারিশ্রমিক পাইবে, যেখানে বর্ত্তমান ভারতবাসীর সর্ব্বদুঃখ-

জনক দারিদ্র্য থাকিবে না। তখন ভারতে বাসকরা আনন্দের কারণ হইবে—আমাদের সব দুঃখ দূর হইবে।

কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বক্তৃতা হইতে দুই এক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম। তিনি বলিতেছেন এই যুগে কেহ আর অস্পৃশ্য থাকিবে না। প্রতিজ্ঞা করুন যে আপনারা 'অস্পৃশ্যদিগকে' উদ্ধার করিবেন তাহাদিগকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং আপনাদের বাসের ও পাকের ঘরে প্রবেশ করিতে দিবেন।"

উদ্ধৃত কথাগুলি হইতে দেখা যাইতেছে পণ্ডিত নেহেরু ও শ্রদ্ধানন্দ স্বামী উভয়েই বর্তমানের জাতিভেদ ও স্পর্শদোষের বিরোধী। নেহেরু বলিয়াছেন—আমরা যেমন রাজনৈতিক অধিকার পাইব রাজনীতি ক্ষেত্রে সকলে সমান হইব, তেমনি সামাজিক অধিকারে ও আমরা সমান হইব। এদেশের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীকে শ্রমিকদিগকে সামাজিক অধিকার দিতে কুণ্ঠিত হইলে দেশের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারময় হইতে পারে তার আভাষ ও তিনি ইউরোপের শ্রমিক ও ধনিকের উল্লেখে দিয়াছেন। আশাকরা যায় তথাকথিত উচ্চজাতির লোকে ইহা মনে রাখিয়া কাজ করিবেন। তাঁহারা যেন মনে রাখেন সকলে এক সঙ্গে না টানিলে জগন্নাথের রথ নড়িবে না। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন বি, এ,

সিরাজগঞ্জ।

বিদেশী বণিকদের বঞ্চনা ও শোষণ এবং কার্য্যতঃ তাহাদের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়ে ইংলণ্ডের রাজার নামে যাঁরা রাজত্ব করেন তাঁদের শাসন ও ত্রাসন—শুধু এতেই কি আমরা এত হতমান, হীনবল ও হৃতসর্ব্বস্ব হয়েছি? না বহুশতাব্দী ধরে আমাদের পাপের ভরা পূর্ণ হতে হতে আজ আমরা কাল-সাগরে ডুবে যাচ্ছি, পৃথিবী থেকে চিরতরে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পেতে বসেছে?

এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে অনন্তজীবনের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য এনে দিতে হলে,

সকলের আগে চাই যে সব মলিনতা আবর্জ্জনাতে তার অভ্যন্তরীন জীবন জীর্ণজরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সেই সব দূর করে ফেলা। এ জাতি আজ ঘুমন্ত অজ্ঞানমোহঘোরে আচ্ছন্ন। কত অলীক স্বপ্নই যে তাকে আত্মভ্রান্ত করে রেখেছে তার সীমা নেই। সজাগ জীবনের মতি ও গতি হারিয়ে এ জাতি কত অসত্যকে যে আজ সত্য করে মেনে নিয়েছে, কত পাপ কদাচারকে যে পুণ্য সদাচার বলে পুষে রেখেছে, তা সংখ্যা করা যায় না। বাস্তব জীবনের কষ্টিপাথরে সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করিয়া নিতে হলে যে শক্তি ও মুক্তির দরকার, তা আমাদের কোথায়?

আমরা সুপ্তির ঘোরে নিসার হয়ে ছিলাম, মায়াস্বপ্নে আত্মবোধ হারিয়েছিলাম—এমন সময় পাঞ্জাবের বুকের উপর এক প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ল, চারিদিকে জাগার সাড়া পড়ে গেল! জেগে আমরা নিজের দিকে চাইলাম, দেখ্‌লাম আমরা অন্নাভাবে শীর্ণ, বস্ত্রাভাবে নগ্ন;—এ বীভৎস দশা দেখে আমরা শিউরে উঠ্‌লাম। যারা আগে জাগ্‌লেন সেই মহাপ্রাণেরা সমস্ত জাতিটা এক আসন্নমরণ মোহের নীলসাগরে মূর্চ্ছিত হয়ে ঢলে পড়েছে দেখে অধীর হয়ে পড়্‌লেন্‌, সকল লাজমান, ভয় লোভ ত্যাগ করে হাহাকার ক'রে পথে ছুটে বেড়াতে লাগ্‌লেন। বাহিরে থেকে এই যে বিপুল আলোড়ন হতে লাগল, তাতে সকলেই বুঝতে পার্‌লেন আর ঘুমাবার সময় নেই। আত্মস্থ বীর যারা তারা অচিরে তাঁদের বাঁধনবেড়ি খুলে ফেলে মুক্তির বাণী প্রচার করতে লাগলেন। কেউ বা জেগে ঘুমালেন, দাসত্বের কালসাপকে তাঁরা সোণার শিকল জেনে গলায় জড়িয়ে ধরে আরামের মোহে মজে দিন্‌পাত কর্‌তে লাগলেন! আমাদের ঘুমপাড়ানী মাসিপিসীরা যখন ভালবাসার সুর ভেজে আর ভুলিয়ে রাখতে পার্‌লেন না, তখন সবাইকে নিয়ে শাসন করে, লোহার খাঁচায় পুরতে লাগলেন। এ অভিনয় আজো পুরোদমে চলছে। ক্রমেই তাঁরা ভীষণ হতে ভীষণতর রূপ ধারণ করেছেন। তাঁদের

শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা দেখে তাঁদের একান্ত বশংবদ ভালো ছেলেরাও প্রমাদ গণেছে, উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছে;—কিন্তু তাতে কি আমাদের শাসন কর্ত্তাদের প্রভুত্বের জিদ কমে? জগতে তাঁরা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সাম্রাজ্যকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্যধন বলে জেনেছেন। তবে যে দিন কালপূর্ণ হবে সেদিন মনে হয়—এই ভেদনীতি তাঁহাদের কি সর্ব্বনাশ করেছে তা তাঁরা বুঝতে পারবেন,—বুঝতে পারিবেন সাম্যস্থাপনই সকল শক্তি ও শান্তির একমাত্র উপায়,—সেদিন হয়ত এঁদের ভাব্‌তে হবে 'নিজেরে করিয়া গৌরবদান, নিজেরে কেবলি করি অপমান।"

যাক্, বড় দুঃখে পরের সমালোচনা কর্‌তে হ'ল। যে জাতের অন্তর থেকে মুক্তির আদর্শ মুছে যাবার উপক্রম হয়েছে, জীবন যাদের অস্বস্থ, শক্তি-হারা তাদের হীনতা ও দুর্ব্বলতার উপরই যে বিদেশী এসে তাদের প্রভুত্বের সৌধ নির্ম্মাণ করেছে সে কথা ভুলে গেলে চল্‌বে না। শত সহস্র ভেদবিভাগে অনর্থক নিয়মকানুনের জীর্ণ জঞ্জালে আমাদের জাতীয় জীবন পঙ্গু ক্ষত বিক্ষত ও অসার হয়ে পড়াতেই, অত সহজে অধীনতা পাশকে মাথা পেতে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। ইংরেজ স্বাধীন জাতি,—জড়-সভ্যতার মোহে অনেক পরিমাণে সত্যন্যায়ের মর্য্যাদাবোধ হারিয়ে থাক্‌লেও আজো তাদের মধ্যে এমন সহৃদয় ব্যক্তির একান্ত অসদ্ভাব নেই যাঁদের প্রাণ সত্যিকার আমাদের দুর্দ্দশা দেখে কাঁদে,—আমাদের মুক্তির চেষ্টার সঙ্গে যাঁহাদের সহানুভূতি আছে। তাই আমাদের ইংরেজ জাতির সঙ্গে কোন বিরোধ নেই, আমাদের সংগ্রাম ইংরেজ আমলাতন্ত্রের সাথে। শুধু প্রভুত্ব গর্ব্বই যে ইংরেজকে বিকৃত করেছে তা নয়, তার বিকারের জন্য আমাদের দাস মনোভাবও নিঃসন্দেহরূপে দায়ী। আমলাতন্ত্র আমাদের মুক্তির বিরোধী তাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তার চাইতেও অনিষ্ট করেছে আমাদের অভ্যন্তরীন জীবনের অনন্ত বিধিনিষেধ। তাই আজ বাহিরে যে স্বাধীনতার আন্দোলন হচ্ছে

তাতে আত্মনিয়োগ করতে হবে বটে; কিন্তু আমাদের 'স্বরাজ' লাভ করতে শুধু আমাদের শাসকদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেই চলবে না। আজ আমাদের ঘরে ফিরতে হবে। নিজেদের চিনতে হবে,' আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে হবে, অসহযোগ নেতিমূলক নয়, এ নৈযুজ্যের মানে স্বাবলম্বন পর-মুখাপেক্ষিতার অভাব। স্বরাজের অর্থ—নিজের স্বত্বকে পূর্ণরূপে পাওয়া, মানবতার চিরন্তন মুক্তিকে ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুক্ত করে তোলা। বড় ভাগ্য, বজ্রবেদনের মধ্য দিয়ে আজ আমরা বুঝতে পারছি স্বাধীনতা হারা জীবনের মরণাধিক নির্ম্মম পরিহাস প্রথমে বাহির থেকে সত্যের যে রুদ্র আহ্বান এনেছে তাতে আমরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সাড়া দেবই,—কিন্তু নিছক রাজনীতিদ্বারা স্বরাজ গড়া যায় না,—জীবনের সমস্ত অংশ জুড়ে রাজনীতির আসনও নয়। অন্তর বাহিরে যে দিন মুক্তিকে আমরা রাজাসনে বসাতে পারব যেদিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাম্য ও স্বাধীনতার নিশান উড়াব সেই দিন আমরা ভারতমাতার হৃত গরিমা উদ্ধার করেছি বলতে পারব। আজ স্বাধীন জীবনের গুরু-দায়িত্ববুদ্ধি থেকে আমরা অনেকটা বুঝতে পেরেছি এতদিন আত্মঘাতী অন্ধের মত ছুঁৎমার্গ অনুসরণ করে আমরা কত দীনহীন অক্ষম হইয়া পড়েছি। ভারত যেদিন দেশবিদেশে ধনৈশ্বর্য্য ও জ্ঞান বিজ্ঞান বিতরণ করিত, সে দিন তার ধর্ম্ম ও সমাজ ব্যবস্থার উদারতার অন্ত ছিল না, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। অন্ত্যজ বর্ণেরা সদাচারী হলেই উন্নীত হত। সেকালে অসবর্ণ-বিবাহের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। আজ আমরা অশিক্ষায় অজ্ঞানতায় সত্যবোধ হারিয়ে ফেলেছি। জীবনের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য, শক্তি ও আনন্দ সকলই আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লোপ পেয়েছে। সমাজ প্রথার কল্যাণে আমাদের জীবনস্রোত ভেদ বিদ্বেষের অতি সঙ্কীর্ণ খাত দিয়ে কোনো প্রকারে বয়ে যাচ্ছে। আজ মুক্তবিশ্বের অনন্ত কর্ম্মশক্তি ও আনন্দ 'তে বিদায় নিয়ে আমাদের ধর্ম্ম ক্ষুদ্র ভাতের হাঁড়ি ও জলের কলসীর মধ্যে ঢুকেছে

ও মিথ্যা জাতিভেদের আশ্রয় নিয়েছে। এত পুণ্য সদাচারেও আমরা শক্তি বা শান্তি পাচ্ছি না। আজ প্রেম নেই; মিলন ও একতা হতে যে শক্তি জাগে তা থেকে আমরা বঞ্চিত। দেশে আজ সত্যদর্শী জ্ঞানী নেই, আছে যারা তাদের অধিকাংশই "শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ"। বিভিন্ন দেশে পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন ধর্ম্ম হয়েছে বটে; কিন্তু সকল দেশের তত্ত্বজ্ঞ সাধকদের বাণীতে একই কথা উচ্চারিত হচ্ছে—সে হচ্ছে সাম্য ও মিলন। জগতে নূতন উন্নতির সত্য আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা, ভট্টাচার্য্য বা মোল্লারা নয়। তার পর অতীতে যা অপূর্ণ রয়ে গেছে ভবিষ্যতে তা পূর্ণ হবে। আমাদের বর্ত্তমান দারিদ্র সমূহ ভবিষ্যৎ অতীত বা বর্ত্তমানের চাইতে উজ্জ্বলতর, বিপুলতর। ভবিষ্যতে যে যুগ আসছে তাতে মানব ত পশুর মত ঘৃণ্য থাক্‌বেই না সে তার দেবত্বের অধিকার প্রাপ্ত হবে;—আর অমৃতের অভিসারে ভারতই হবে পথ-প্রদর্শক। ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ;—আর মানব মাত্রেরই এই ব্রাহ্মণ্যের বা দেবত্বে সমান অধিকার আছে। আজ পঞ্চম, পারিয়া, শূদ্র চণ্ডাল সকলেই যে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী এ কথা তাদের মুক্তউদাত্ত কণ্ঠে শুনিয়ে দিতে হবে। এ তাদের উপর কিছু অতিরিক্ত অনুগ্রহ প্রকাশ নয়। সমাজের অগ্রণী যারা তাঁরা যদি অগ্রসর হন তা হলেই তারা বাঁচবেন, জগতের শান্তি বৃদ্ধি পাবে, অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। তাঁরা তাঁদের মিথ্যা মান বিসর্জ্জন দিতে না পার্‌লে ও, দেবতা পথের ধূলায় পড়ে থাক্‌বে না।

আজ পৃথিবী জুড়ে মহামানব জাগ্‌ছে, এ সত্যের প্রেরণাকে ব্যর্থ করে এমন শক্তি নেই। আজ যদি আমরা জাতিবর্ণের ভেদবুদ্ধি না ভুলে যাই তবে অচিরে দেখ্‌তে পাব, কবি যে গেয়েছিলেন,—

> হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
> অপমানে হতে হবে তাদের সমান।

সেই কথা সফল হয়েছে—আমাদের স্বরাজের স্বপ্নও শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। যাদের অপমান করে আজ আমরা শক্তিহীন, মনুষত্ব-বর্জ্জিত হয়েছি তাদের সমান হলেই আমাদের হবে যথার্থ সম্মান, সেই মহামিলনের নবীন উষায়ই স্বরাজ সূর্য্য দীপ্তশ্রীতে মহিমময় হয়ে উঠ্‌বে।

ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। মানব তার আত্মার গৌরবে চির-মহিমান্বিত ; জগতের প্রতি মানবের মধ্যে সেই আত্মা, বিশ্ব চরাচরের অন্তর-বাহির যিনি পরিব্যাপ্ত ক'রে রয়েছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অনন্ত উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে, তার অন্তরে ভগবত্তার বীজ নিহিত আছে। এ জগতে মানবাত্মা চিরমুক্ত, অমৃতের অধিকারী। আত্মার জাতি নেই, মলিনতার স্পর্শ নেই। সচ্চিদানন্দের মূর্ত্ত বিগ্রহ মানবকে অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করবার স্পর্দ্ধা করতে পারে এমন অজ্ঞানতা, এমন দুরভিমানতা আছে কার ? ঐ নরের মাঝে যে নারায়ণ আছেন, ঐ মাটির ঘরে যে নিরঞ্জনের আসন পাতা আছে ! আমরা নীচ বলে মানুষকে ঘৃণা করে যে আমাদের পূজার ঠাকুরকে অবমাননা করি। মানুষ হীন,—এ মিথ্যা কথা শুধু জড়বাদী নাস্তিকের মুখে শোভা পায়। উপনিষদের আত্মতত্ত্ব যে হিন্দুর জীবনের গোড়ার কথা তার কাছে মানবতার অবমাননা যে বড়ই দুঃসহ, বড়ই বিসদৃশ ;—তাইত মহাত্মাজী অস্পৃশ্যতাকে মহাপাপ বলেছেন। মানুষ ক্ষুদ্র হয় অজ্ঞানে ডুবে ;—অপরকে হীনও করে অজ্ঞানের অভাবে। মানুষ যখন তার স্বরূপ উপলব্ধি করে, যখন সকলের মধ্যেই আত্মাকে দর্শন করে তখন তার প্রাণে অখণ্ডতার বোধ থেকে বিপুল শক্তি জাগে, তখন তার চক্ষে সবাই হয় বিরাট ও মহান্। তার ভেদবুদ্ধিজনিত অহঙ্কারে অন্ধকার কেটে যায়। বিশ্বের সঙ্গে অভিন্ন অনু-ভূতির অসীম শক্তি সে পায়। এই আত্মজ্ঞানটী আসলেই আমাদের সকল ভেদগণ্ডী দূর হয়ে যাবে। ঐ বোধি, ঐ বিজ্ঞানের জ্যোতিফোয়ারায় স্নান করে আমরা যে অমর বীর্য্য লাভ করতে পারব—তা থেকে গ'ড়ে উঠ্‌বে

স্বাধীন ভারত নয়—মহান্ ভারত। শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেন এম, এ, লিখিত "অস্পৃশ্যতা"। (বাঙ্গালার কথা)

"জাতিভেদ ও স্পর্শ-দোষ-প্রথা বেদানু-মোদিত নহে। সুতরাং উহা উঠাইয়া দিলে হিন্দু-ধর্ম্মের কোন ক্ষতি হয় না। এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা না করিয়া এবং কি প্রকারে এই অশাস্ত্রীয় ব্যবহার উঠাইয়া দিতে পারা যায়, তদ্বিষয় কোন প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন না করিয়া, আমাদের নেতৃগণের পক্ষে স্বদেশী-আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়া অন্যায় হইয়াছে। স্পর্শ-দোষ-প্রথা থাকা-সত্বে, হিন্দুর যে বিভিন্ন জাতি গুলি আছে, তাহাদের মধ্যেও কি পরস্পর প্রেমালিঙ্গন হয়? হে শিক্ষিতা-ভিমানী কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ! তুমি কি প্রকৃত প্রস্তাবে নমঃশূদ্র (চণ্ডাল) গণের সহিত প্রেমালিঙ্গন কর?

নিম্নশ্রেণীরা প্রকাশ্য ভাবে বলিতেছেন, কুকুর স্পর্শেও যে দোষ ও ঘৃণার উদয় না হয়, হিন্দুর নিম্নশ্রেণীর স্পর্শে তদপেক্ষা অধিক ঘৃণার উদ্রেক হয়; একথা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার? ঠিক্ সমগ্র নমঃশূদ্রাদি অনাচরণীয় হিন্দুর মনের ভাব এইরূপ। তাই বলিতেছি, অগ্রে স্পর্শ-দোষ প্রথা উঠাইয়া দেও, তার পরে স্বদেশীয় আন্দোলন কর।

তুমি হয়ত বলিবে যে, স্পর্শ-দোষ প্রথা উঠাইলে, জল-চল করিলে, হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট হয়। কথাটা সত্য নয়। স্পর্শ-দোষ প্রথা থাকাতেই হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট হইতেছে, কেন না উহা বেদানুমোদিত নহে। সে যাহা হউক, মানিয়া লইলাম, লোকাচারই তোমার ধর্ম্ম এবং স্পর্শ-দোষ-প্রথা উঠাইয়া দিলে সে ধর্ম্ম থাকে কই? কিন্তু ধর্ম্মটা কি কেবল তোমার? অনাচারণীয় হিন্দুর কি এই হিন্দুধর্ম্ম নহে? তাহার পক্ষে স্পর্শ-দোষ-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া স্বার্থ ও ধর্ম্ম। সুতরাং তোমার যাহা অধর্ম্ম তাহার তাহা ধর্ম্ম। সুতরাং তুমি অনাচারণীয় হিন্দুকে কি প্রকারে প্রেমালিঙ্গন দিবে? সেই বা কেন তোমার জন্য রক্তপাত করিতে আসিবে? আমি অবগত আছি ১৮৯১ সনের সেন্সাসের পূর্ব্বে কোন একটী

মহকুমার উকীল ও মোক্তারগণের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিকেও পাওয়া গেল না যে, চণ্ডালগণের পক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকটে একখানি আবেদন পত্রের মোসোবিদা করিয়া দেন। টাকা দিয়াও চণ্ডালগণ উক্ত ঘৃণিত নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নমঃশূদ্র বা শূদ্র নামে সরকারী সেরেস্তায় লিখিত হইবার জন্য ২০ জন ব্যবসায়ীর মধ্যে এক জনের হস্তও ক্রয় করিতে পারিল না। তাঁহারা বলিলেন চণ্ডাল শূদ্র বা নমঃশূদ্র হইবে, ইহার দরখাস্ত লিখিতে যাইবে কে? তাঁহাদের এই বিরুদ্ধতায় চণ্ডালগণের কোন ক্ষতি হয় নাই; তাঁহারা সেই সেন্‌সাস হইতেই নমঃশূদ্র বলিয়া সরকারী কাগজ-পত্রে লিখিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহা দ্বারা উচ্চ-শ্রেণী হিন্দুর মনের ভাব তাহাদের নিকট সম্যক উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যে নিম্নশ্রেণীর প্রতি সদ্ব্যবহারে কুণ্ঠিত, ইহা আর বুঝিতে বাকী নাই। আমরা যে এক্ষণে তাহাদিগকে স্বদেশী ও স্বজাতি বলিয়া ব্যক্ত করিতেছি, ইহা যে আমাদের অন্তরের কথা নহে—প্রবঞ্চনা বাক্য, তাহা নিম্নশ্রেণী হিন্দুরা ক্রমশঃ বুঝিয়া উঠিতেছে।

ঘৃণাতেই ঘৃণা উৎপাদন করে। ইহা আমাদের শাস্ত্রেও আছে।—

"তোমার উত্তাপে তারে করহ দাহন
হে অগ্নে! যে ঘৃণা করে, য'রে ঘৃণা করি। ১
তোমার জ্বালায়ে তারে কর জ্বালাতন;
হে অগ্নে! যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি।" ২

অথর্ব্ববেদ ২।১৯

এজন্য বলিতেছি "পাড়াবাসী প্রতি প্রেম" এই মহামন্ত্র যদি গ্রহণ করিতে চাও, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর সহিত সজল ব্যবহারে প্রবৃত্ত হও; প্রকৃত জাতীয়তার বীজ বপন কর। ইহাতে হিন্দু ধর্ম্ম যাইবে না, প্রোজ্জ্বল হইবে। আমি অবগত আছি, বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের চেষ্টায় বরিশাল জেলার স্থানে স্থানে তাহাদের ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে ডাকাইয়া আনিয়া

স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। এতাদৃশ একজন ব্রাহ্মণের সহিত আমার ঐ বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল, তিনি বলেন, আমার যজমান নমঃশূদ্রেরা বলে, স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের যোগ দিয়া কল কি ? আমাদের সহিত উচ্চশ্রেণী হিন্দুর কখনইত মিলন হইবে না ! আমরা অস্পৃশ্য থাকিব, ফাটকে গেলে মেথরের কাজ করিব, ইহার কোন প্রতিবিধান করা হইবে না, অনর্থক রাজার সহিত কলহ করিতে যাইব কেন ? তারপর বিদেশী বস্ত্র খরিদ না করিয়া দেশী বস্ত্র খরিদে সম্প্রতি অর্থ ব্যয় বেশী। বর্ণবিপ্র মহাশয় যখন এই কথাগুলি বলিলেন আমি দেখিলাম, আমাদের শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা এই অশিক্ষিত নমঃশূদ্রগণ রাজনীতি ও সমাজনীতি ভাল বুঝে। বরিশালের নমঃশূদ্রের কথা ত বলিলাম। তাহাদের মনের ভাব পাঠক জানিতে পারিলেন। এক্ষণে ফরিদপুরের নমঃশূদ্রের কথা বলি। ফরিদপুরে মোট হিন্দু সংখ্যা ৫,৭০,০০০, তন্মধ্যে নমঃশূদ্র সংখ্যা ৩,২০,০০০। গত দুর্ভিক্ষের সময় শ্রদ্ধাস্পদ নব্যভারত সম্পাদক এই নমঃশূদ্র-প্রধান জেলায় অনেক স্থানে রিলিফ কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন (নব্যভারত, গত পৌষ মাঘ সংখ্যা) নমঃশূদ্রের মধ্যে যাহারা রাজদ্বারে চাকরী বা ব্যবসায় করিতেছেন, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে "বয়কট" করিতেছেন এবং নানা রকমে তাহাদের উন্নতির ব্যাঘাত করিতেছেন।

তোমরা ভাবিতেছ, ধর্ম্মসম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড জাতীয়তার মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবে। তাহার নাকি ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপিত হইয়াছে। জাপানে কতকটা এরূপ আছে বলিয়া তোমাদের ধারণা। এরূপ ধারণা হইয়া থাকিলে, ইহা ভুল। জাপান ঠিক্ হিন্দুস্থানের মত নহে। সেখানে সমাজে কোন বিভিন্নতা নাই। কেহ বৌদ্ধ, কেহ খ্রীষ্টান হইতে পারে কিন্তু খায় দায় একত্রে। তাঁহাদের স্পর্শ-দোষ-প্রথা নাই। তাই বলি, যদি-

স্বদেশীয়তা রক্ষা করিতে চাও, স্পর্শদোষ প্রথা উঠাইয়া দাও। একজন নমঃশূদ্র বা অন্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর সহিত সজল ব্যবহার করিলে সহস্রখানি বিলাতী-বস্ত্র পরিবর্জ্জনের ফল আছে। শ্রীমধুসূদন সরকার। (নব্যভারত, আষাঢ়, ১৩১৪)

"হিন্দু হিন্দুকে ঘৃণা করে, হিন্দু হিন্দুকে স্পর্শ করিলে আপনাকে অপবিত্র মনে করে, হিন্দু হিন্দুর জলগ্রহণ করে না ; এই জন্যই হিন্দুর সর্ব্বস্ব গিয়াছে। তবু হিন্দুর চৈতন্য হইতেছে না। ইহাই মৃত্যুর লক্ষণ।

হিন্দু হিন্দুকে ঘৃণা করিয়া অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই ঘৃণা পরিত্যাগ করিতে হইবে। হিন্দু হিন্দুর জল স্পর্শ না করাতে হিন্দু প্রাণশূন্য হইতেছে। হিন্দু যে বর্ণেরই হউক, তাহার জল গ্রহণ করিতে হইবে। যদি না কর, তোমার মৃত্যু কে বন্ধ করিবে ?

তুমি ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালা দেশে তুমি কয়জন ? খাস বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১০ লক্ষ মাত্র। কায়স্থ ! তোমার সংখ্যাই বা কত ? বাঙ্গলা দেশে কায়স্থের সংখ্যা ৮ লক্ষ ৪৫ হাজার মাত্র। বৈদ্যের সংখ্যা কেবলমাত্র ৩১ হাজার। তোমরা বাঙ্গালা দেশের ১৮ লক্ষ নমঃশূদ্র, ১৫।। লক্ষ রাজবংশী, ৭ লক্ষ বাগদী, ৫ লক্ষ বাউরি, ৪ লক্ষ পোদকে অনাচরণীয় রাখিয়া কখনও শক্তিশালী হইবার আশা করিও না। তোমরা ৩½ লক্ষ সাহা, ২৫ হাজার সুবর্ণ বণিকের কি দুর্দ্দশাই না করিয়াছ। তাঁহারা ধনে বা গুণে কোন অংশে হীন নহেন, অথচ তাঁহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া রাখিয়াছ।

হিন্দু যদি ধ্বংস হইতে না চাও, তবে হিন্দু নামধারী সকলেই বেশী কিছু যদি আপাততঃ না করিতে পার, তবে তাহাদিগের জল গ্রহণ কর।

বাঙ্গালা দেশে কি ভীষণ মূর্খতা ! ৪ কোটি ৯৬ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ সম্পূর্ণ নিরক্ষর ! বাঙ্গালা দেশে ২ কোটি ৫৪ লক্ষ মুসলমানের বাস। ইহার মধ্যে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ সম্পূর্ণ নিরক্ষর।

বাঙ্গালা দেশের ৩৩ লক্ষ হিন্দু আর ৯ লক্ষ মুসলমান ব্যতীত আর কাহারও অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত নাই; এইরূপ মূর্খ লোক লইয়া চাষ বাস করিবে, আর শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিবে? পৃথিবীর সুশিক্ষিত চাষা শিল্পীর সহিত প্রতিযোগিতা করিবে? তাহার যে ফল হইতেছে, তাহা ত দেখিতেছ। বিদেশীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে আমরা প্রত্যেক বিষয়েই হারিয়া যাইতেছি। যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাও, তবে নিরক্ষরদিগকে শিক্ষা দেও।" ফরিদপুর সমাজ-সংস্কার-সমিতি (সঞ্জীবনী)।

"দেশের নেতাগণ শিমলা শৈলে চর্ব্ব্য, চোষ্য লেহ্য, পেয় ষোড়শোপচারে সম্ভোগ ক'রে লাট দরবারে গোটাকতক রিজোলিউশন পাশ করিয়ে মৃত ভারতকে তুলিতে চান, তা' কি সম্ভব? এদেশের অসংখ্য লোক অস্পৃশ্য। মৃত শবকেও মানুষ ছোঁয় এদের কেউ ছোঁয় না। মৃত শবকেও মানুষ বুকে জড়িয়ে কাঁদে—এদের জন্য কেউ অশ্রুপাত করে না। এদের অবস্থা শবাপেক্ষাও শোচনীয়। ঈশ্বরের কৃপায় আমি প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া এদের ভিতর কাজ করিতেছি। কিন্তু এদের তোলা যে কি কঠিন তা আর কি বলিব। একাজ মনুষ্য শক্তির অতীত। জন সমাজের নিম্নতম স্তরে মহাপঙ্কে এরা ডুবে আছে। নামে শুধু মানুষ—অবস্থায় পশু অপেক্ষাও হীন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের কথাত জানেই না—নৈতিক জীবন মহা পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত। আজ একটু তুলিলাম, কাল আবার চতুর্গুণ নীচে পড়িয়া গেল। তা' ছাড়া যাঁ'রা তাদের তুলিতে চায়, অন্তলোকে তাহাদিগকে উৎপীড়ন করে—গড়া কাজ ভেঙ্গে ফেলতে চেষ্টা করে। লাটসাহেবের সভায় গিয়া এদের সপক্ষে বলা অতি সহজ। কিন্তু গ্রামের যে কূপ হইতে তুমি জল তোল, সেই কূপ হইতে এদের জল তুলিতে দেওয়া সহজ নহে। শুধু কথায় চিড়ে ভিজে না। অস্পৃশ্যদের তুলতে হলে, তোমায় অস্পৃশ্য হ'তে হবে। তা'দের পূর্ণ সংস্পর্শে আসিতে হইবে। ভাই ব'লে তাদের গলা

জড়িয়ে ধরিতে হইবে। মুখে মুখ বুকে বুক না রাখিলে এ মৃতে প্রাণ আসিবে না।

* * * মৃত ভারতকে প্রাণ দিতে হইলে এই সাধন চাই। যাদের তুমি হাত দিয়ে ছোবে না, তাদের জন্ম গোটাকতক রিজলিউশন পাশ করিয়ে তাদের তুমি তুলিতে পারিবে না। তুমি হিন্দু হও, মুসলমান হও, ব্রাহ্ম হও, আর খৃষ্টান হও, যতদিন এই সহানুভূতি ও সমবেদনা মন্ত্রে দীক্ষিত না হইবে, ততদিন তুমি ভাবতে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিবে না। * * *"
শ্রীবিনোদবিহারী রায়। শবসাধন, ভাদ্র, নব্যভারত।

মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার পঞ্চম সভ্য।—মাদ্রাজের পঞ্চমরা তথাকার ব্রাহ্মণদের কর্ত্তৃক যেমন ঘৃণিত হইয়া থাকে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবরে কোন পঞ্চম ৪৮ হাত মধ্যে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণেরা অশুচি হইয়া থাকে।

সংপ্রতি আদি দ্রাবিড় জনসভার সম্পাদক মিঃ রাজা মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছেন। তিনি পঞ্চম সম্প্রদায় ভুক্ত। এখন ব্যবস্থাপক সভায় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চ বর্ণের সভ্যগণ পঞ্চমের পার্শ্বে তুল্য আসনে আসীন হইবেন। এক সঙ্গে তাহারা রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব আলোচনা করিবেন। ইহাদের জাতির অভিমান অতিরিক্ত। তাহারা কি এখন লাট মজলিসে যাইতে বিরত হইবেন? পঞ্চমের হাওয়া, ছায়া, স্পর্শ, দৃষ্টি এমন কি বাক্যও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণদের এখন ক্রমে ক্রমে সহিয়া আসিবে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলা গাছির জাতীয় বিদ্যালয়ে জনমন মুগ্ধকারী বক্তৃতায় জাতিভেদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

আমরা হিন্দুজাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া ক্রমশঃ হীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি। ফলে যেখানে আমরা কয়েকটী, সেখানে মুসলমান ৫০।৬০ জন। তাই আমাদিগকে অনেক জটিল সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে।'

এর ছোঁয়া জল খাইব না, ওর ছোঁয়া জল খাইব না, ইত্যাদি ভণ্ডামি ও কপটাচারে সমাজ জর্জ্জরিত। হিন্দু-সমাজ গেল। মুসলমান ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে আরও পঞ্চাশ বৎসর পরে গঙ্গার ওপারের সমস্ত হিন্দু মুসলমান হবে। গঙ্গার ওপারের হিন্দুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বেশী বলিয়া, নিম্নশ্রেণী হিন্দুগণের প্রতি. অত্যাচার বেশী, সেজন্য তারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। (সত্যবাদী)

জাতি ভেদ ও অস্পৃশ্যতার মহাপাপ সম্বন্ধে সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহোদয় বিগত কাশী হিন্দু-মহাসভায় বলিয়াছেন :—আমার দৃষ্টিতে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী ও চণ্ডাল উভয়েই আমার ভাই। যদি কোন চণ্ডালের সন্তানকে দেখিয়া আমার মনে প্রেমের উদয় না হয় তবে যেন আমার পরমাত্মা দোষী হয়। কিন্তু আমি চতুর্ব্বর্ণে বিশ্বাস করি। আমাদের এই হিন্দুধর্ম্মের বিরাট ইমারতে যদি কোনও নূতন দরজা জানালা খুলিতে হয় তবে খুলিব ; কিন্তু তাই বলিয়া কাহাকেও এই ইমারত ভাঙ্গিতে দিব না।

হিন্দু-মহাসভা সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর,—সে চণ্ডালই হউক আর আর ব্রাহ্মণই হউক। আমাদের চামার ভাই রাম নাম করে, শিখা বাঁধে, দুই চারিটা পয়সা হইলে রামজীর মন্দির নির্ম্মাণ করায়। কাশীর হরিশ্চন্দ্র ঘাটের মন্দির এক চামাব নির্ম্মাণ করাইয়াছে। সেই চামার কি আমার ভাই নয় ? আমার চামার ভাই আমার কত সেবা করে,—সকল সেবার চেয়ে যে সেরা সেবা—সে তাহাই করে ; সে দুই তিনবার আমার বাড়ীর ময়লা পরিষ্কার করে ; না করিলে আমার বাড়ীতে টেকা দায় হইত। আর ইংরেজের সঙ্গে আমার কত প্রভেদ ; সে শৌচ করে ন', ২।৪ মাস স্নান না করিয়া থাকে, কত অখাদ্য ভক্ষণ করে। সভাসমিতিতে, কাউন্সিলে সর্ব্বত্র আমি তাহাকে ছুঁই, আদর করি। তাহাকে ছুঁইলে আমার জাত যায় না, কিন্তু আমার যে রামদাস চামার, সে রাম নাম করিয়া স্নান করিয়া সভায়

আসিলে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহাকে মন্দিরে ঢুকিতে দেওয়া হয় না।

আজ প্রাতে আমি বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়াছিলাম। জীবনের কোনও সঙ্কটের দিন উপস্থিত হইলে আমি বিশ্বনাথজীর মন্দিরে যাই। মন্দিরে মধ্যে চারিদিকে কেহ উপাসনা করিতেছিল; কেহ পূজা, কেহ স্তবপাঠ করিতে-ছিল; তাহাদের মধ্যে আমার গ্রামের কয়েকজন শূদ্রও ছিল। তাহারাও কত ভক্তির সহিত পূজা করিতেছিল। ভাইসকল সভায় উপস্থিত বিদ্বৎ-মণ্ডলী আজ আপনাদের নিকট আমার প্রার্থনা—আমার ভিক্ষা যে,—যাব ভগবানে বিশ্বাস আছে,—যে ভগবানের নাম লয়,—সে যেন প্রবেশ কবিয়া ঢুকিতে ভগবানের দর্শন পায়।

আর নীচজাতিকে গ্রামের কূপ হইতে জল লইতে দেওয়া হয় না। মিশনারীরা হ্যাট কোট ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া উহাকে বলে যে হিন্দুরা তোমাকে ঘৃণা করে, তুমি খ্রীষ্টান হও। মুসলমানও তাই বলে। সে খ্রীষ্টান হইলে গ্রামের কূপ হইতে তাহার জল লইবার আর বাধা থাকে না। ইহার ফলে দলে দলে লোক অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। মীরাটের জমিদাব আমাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁগব চামার প্রজারা দলে দলে খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে। তিনি জমিদাব হইয়াও এই খ্রীষ্টান প্রজাদের জ্বালায় অস্থিব হইয়া উঠিয়াছেন। তাহারা জোবজবরদস্তি করে, জমিদার তাহার কোনও প্রতিকার করিতে পারেন না। কারণ তিনি আদালতে নালিশ কবিলে মিশনারী সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটেব নিকট নোট (note) পাঠান, ফলে সব ডিশমিশ হইয়া যায়। অন্য জাতি আমার মন্দির আক্রমণ করিতে আসিলে চামার ভাঙ্গী তাহাতে বাধা দেয়, তাহার জন্য প্রাণ দেয়, আর সেই চামার সেই ভাঙ্গীকে আমরা মন্দিরে ঢুকিতে দিই না; কূপ হইতে জল লইতে দিই না। আমার চণ্ডাল ভাই গ্রামে থাকে, গ্রাম সাফ রাখে, গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা করে,

নিজে সারাদিন অপরিষ্কার কাজ করিয়া সন্ধ্যার সময় যখন স্নান করিবার জন্ত কূয়ার জল তুলিতে যায় তখন তাহাকে জল তুলিতে দেওয়া হয় না। সর্ব্ব-জাতির লোক, মুসলমান খ্রীষ্টান সকলে কূয়া হইতে জল লইয়া যায়, কেহ তাহাদিগকে বারণ করে না। কিন্তু আমার ভাই আমার ধর্ম্মরক্ষাকারী, আমার স্বাস্থ্যরক্ষাকারী, আমার জীবন রক্ষাকারী ভাইকে জল লইতে দেওয়া হয় না।

আচার্য্য রায় অন্যত্র বলিয়াছেন—প্রত্যেক I. Sc র ছাত্র জানে যে, hydrogen ও Oxygen এর রাসায়নিক সংযোগে জল উৎপন্ন হয়। সেই জল যদি কাঁচপাত্রে থাকা অবস্থায় কোন নমঃশূদ্র স্পর্শ করে, অমনি তাহা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চবর্ণভুক্ত সম্প্রদায়ের অপেয় হইয়া যায়; কিন্তু কেন? কাচ non-porous, non conductor of Electricity এবং bad conductor of heat, তবুও গ্লাস ছুঁইলে তাহার ভিতরস্থ পানীয় কি প্রকারে অশুচি হয়, তাহা বৈজ্ঞানিক ও নৈয়ায়িকগণও বলিতে অক্ষম। অথচ সেই জল অবস্থাবিশেষে লেমনেড রূপে স্নিগ্ধ হইলে বা জমাট বাঁধিয়া শীতল বরফ হইলে স্পর্শদুষ্ট হইবার ভয় থাকে না। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, জনৈক ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধে, অধ্যাপকমণ্ডলী বরফ দেওয়া স্নিগ্ধ পানীয় ব্যবহার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কেন, ভাটপাড়ার বৈদিক ব্রাহ্মণেরা, গঙ্গাস্নান করিয়া, নামাবলী গায় দিয়া, গায়ত্রী জপ করিতে করিতে পবিত্র গঙ্গাজলে, শাস্ত্রসম্মত প্রণালীতে কি বরফ তৈয়ারী করেন? বরফ লেমনেডে জাত যায় না, কিন্তু একজন সুবর্ণ বণিক ব্রাহ্মণকে পরিবেষন করিলে তার জাতি নষ্ট হয়। মানুষ মানুষের ছোঁয়া খায় না এর চেয়ে নীচতা, এর চেয়ে পাপ জগতে আর আছে কিনা আমি জানি না।

গলায় একগোছা সাদা সূতা থাকিলে তাদের হাতে খেতে আমাদের কোন আপত্তিই থাকে না। তা ঐ পৈতাধারী বিহার উড়িষ্যার যে কোন নীচ

বংশসম্ভূত হউক না কেন। অনেক ডাক্তার বলেন যে কলিকাতায় শতকরা ৯৫ জন রাঁধুনী বামুনের দেহে কুৎসিৎ ব্যাধি আছে। আমরা অম্লানবদনে তাদের স্পৃষ্ট অন্ন খাই। কিন্তু শুদ্ধাচারী তথাকথিত নিম্ন জাতির ছোঁয়া খাইতে নাসিকা সঙ্কুচিত করি। অবশ্য আপনারা জানেন, অনেক মুখ্য কুলীনই লাট প্রাসাদে নৈশ ভোজনে যোগ দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। আমি ব'লে থাকি বাংলাদেশের যুবকবৃন্দ আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা স্থল—কিন্তু তাদের মধ্যে এই সব ভণ্ডামী দেখলে হতাশ হইতে হয়। লেখাপড়া শিখে, B. A, B. Sc. এমন কি D Sc, P. R S. হয়েও cleanliness is next to godliness এই সার বাক্যটীর উপর অনেকের শ্রদ্ধা দেখা যায় না —বোধ হয় জাত যাবার ভয়ে। এই জাত যাবার ভয়ই যে জাতি লোপ পাবার অন্যতম কারণ তা কেউ ভেবে দেখেছেন কি?

Plague এ দেশ সময় সময় উজাড় হয়ে যায়—একস্থানে আরম্ভ হ'লে বায়ুগতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কেল্লার ভিতরে Plague হয় কি? কেন হয় না? Plague কি কামানের ভয়ে কেল্লায় ঢুকতে সাহস পায় না? তা নয়, উহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সুফল। প্লেগ, কলেরা সব সময়েই বস্তিতে, অপরিষ্কৃত অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার স্থানেই বেশী প্রকাশ পায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা সকলেরই ইচ্ছাধীন, বাতাস ও সূর্য্যের আলোর জন্য এখনও tax দিতে হয় না। তবুও ভগবানের দেওয়া এই দুটো জিনিস থেকেই আমরা দূরে থাকি। কলের পরিষ্কৃত জল খাই না, কিন্তু আবর্জ্জনা দুষ্ট, অপরিষ্কার নদীর জলের পক্ষপাতী কেন না শাস্ত্রানুসারে উহাই শুদ্ধ। অবশ্য এখানে মনে রাখা দরকার শাস্ত্রকারগণের সময়ের নদীর অবস্থা আর বর্ত্তমান সময়ের নদীর অবস্থার কত প্রভেদ। দেখা গিয়াছে, পরিষ্কৃত জল ব্যবহার করাতে কলেরার প্রকোপ অনেক কমে গেছে। এখনও অনেক স্থানে পাইখানা ও কুয়া পাশাপাশি তৈয়ারী করা হয়, উহাতে পাইখানার

ময়লা সছিদ্র মাটির ভিতর দিয়া কূপের ভিতর পড়িয়া কূপের জলকে দূষিত করে।

অস্পৃশ্যতার কথা একটু পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন আমরা ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্ন জাতিদিগকে দিন দিন নিজেদের নিকট হইতে তফাৎ করিয়া দিতেছি—ফলে তারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে। আর সমাজে যারা স্বধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আছে, তারা উচ্চ সম্প্রদায়ের উপর খড়্গহস্ত। আপনারা ত সকলেই জানেন যে, দেশের কার্য্যে, দেশোন্নতির পবিত্র যজ্ঞে সকলেরই সমান অধিকার, সকলেরই সমান প্রয়োজন—তবুও কেন মানুষ হইয়া মানুষকে মানুষের নিকট থেকে পৃথক করিয়া রাখার ব্যবস্থা? গত মহাযুদ্ধে যদি লক্ষ লক্ষ ফরাসী ইংরাজ আত্মোৎসর্গ না করিত, তবে মারসেল ফস বা লর্ড হগএর সাধ্য কি, তাঁহারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করেন? দেশের নেতারা সব কাজেই বাহবা পাইয়া থাকেন, কিন্তু সে শুধু নীরব কর্ম্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।

(সমাজ সেবা-"আনন্দ বাজার পত্রিকা")

আচার্য্য রায় বিক্রমপুরে অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"অস্পৃশ্যতা জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায়। ইহা সমাজ হইতে সর্ব্ব প্রযত্নে দূর করিতে হইবে। অস্পৃশ্যতা নিম্নজাতির প্রতি অত্যাচারের নামান্তর মাত্র। মুসলমান ভ্রাতাগণ হিন্দুগণ হইতে এ বিষয়ে অনেক উদার। হিন্দুদের মন্দিরে সকলের প্রবেশের অধিকার নাই, কিন্তু মুসলমানের মসজিদে সকলেই প্রবেশ করিতে পারে। দেখিয়াছি আফগানিস্থানের আমীরের সহিত এ দেশের ভিস্তিও একাসনে বসিয়া নমাজ পড়িয়াছিল। আর আমাদের সমাজের অস্পৃশ্য জাতিদের মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। দেবমন্দির হইতে বহুদূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেবদর্শন করিতে হয়। ইহা ছাড়া নানা ভাবে আমরা নিম্নজাতির উপর অত্যাচার করিয়া আসিতেছি। তাহার ফলে

আমরা সাধারণ লোক হইতে ক্রমেই দূরে সরিয়া পড়িতেছি। প্রকৃতপক্ষে আমরা এতদিন তাহাদিগের সহিতই অসহযোগ করিয়া আসিতেছি। এখন আমাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

যে সকল জাতি উপেক্ষিত রহিয়াছে, তাহাদের উন্নতি সাধন গুরুতর প্রশ্ন। এ দেশে যুগযুগান্তর ধরিয়া কোটি কোটি লোকে জ্ঞানের আলোকে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, সমাজ তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছে, নির্য্যাতন করিয়াছে, নিম্নস্তরে স্থান দান করিয়াছে। তাহারাও এতদিন আপনাদিগকে হীন বলিয়াই মনে করিয়াছে। যে দেশে শতকরা ৯৪ জন লিখিতে পড়িতে জানে না— সে দেশের উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? বর্ত্তমানে ভারতে যে নব জাগরণ আসিয়াছে, তাহাতে উপেক্ষিত জাতিগণও জাগ্রত হইয়া আপনাদের অধিকার লাভের দাবী করিতেছেন, আপনাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতেছেন; ইহা অতি শুভলক্ষণ। কিন্তু এই জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল জাতি তাহা-দিগকে এত হীন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি ইহাদের ঘোরতর বিদ্বেষ ভাব জাগিয়াছে। সে দিন আর্য্যসমাজ গৃহে যে "সর্ব্ববঙ্গ-শিক্ষা সমিতি"র অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে উপেক্ষিত জাতির কোন কোন শিক্ষিত লোক বলিতে ক্রটী করেন নাই—"আমরা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা হিন্দুসমাজ দেন নাই রাজা দিয়াছেন, উচ্চ বর্ণের রক্ষণশীল হিন্দুগণ ও জমিদারগণ আমাদের শিক্ষার বিরোধী।" যদি তাহারা সকলে মন খুলিয়া কথা বলিতে পারিতেন, তবে অনেকেই এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। তাঁহারা এক্ষণে শিক্ষা করিতেছেন। সমাজে কতকগুলি অধিকার চাহিতেছেন। তাঁহারা সমাজের দ্বারে আসিয়া বলিতেছেন,—তোমরা দিবে, না, আমরা গ্রহণ করিব। তাহাদের দাবী এখন আর অগ্রাহ্য করার সাধ্য নাই। তাহাদের উন্নতি না হইলে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার না হইলে, তাহাদের মনুষ্যত্ব ফুটিয়া না উঠিলে, দেশের উন্নতি হইবে না। তাঁহারা যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে

তাহাদের উন্নতি অনিবার্য্য, উহাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই সময়ে উচ্চবর্ণের শিক্ষিত সমাজ যদি তাহাদিগকে সাহায্য না করেন, তাহাদিগকে হাত ধরিয়া না তোলেন, তবে তাহারা দেশহিত-সাধনে সহায় হইবেন না। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে কেবল প্রস্তাব ধার্য্য করিলেই চলিবে না, তাহাদিগের মধ্যে স্কুল পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহারা কতগুলি সামাজিক অধিকার চাহিতেছেন; তাহারা জলচল চাহিতেছেন, ধোবা নাপিত চাহিতেছেন, এই সকল অধিকার প্রদান করা কর্ত্তব্য। মানুষকে মানুষ বলিয়া মান্য করিতে হইবে—তাহাদিগকে পশু পক্ষী অপেক্ষাও হীন চক্ষে দেখিলে চলিবে না। জানি, আজ তাঁহারা যে অধিকার চাহিতেছেন, এই অধিকার প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাদের দাবী আরও বৃদ্ধি হইবে। তাহাতে হানি কি? রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্রমেই অধিকতর অধিকার দাবী করিতেছেন, তাঁহারা এই চিরলাঞ্ছিত উপেক্ষিত জাতির দাবী যদি অগ্রাহ্য করেন তবে তাঁহাদের জীবনে সামঞ্জস্য থাকে কোথায়? জাতিভেদ, বর্ণভেদ এদেশের অধঃপতনের প্রধান কারণ; এই জাতিভেদ দূর করিয়া সমগ্র ভারতীয় জাতি সমূহকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে হইবে। "সমাজ-সংস্কার-সমিতি" আপাততঃ জাতিভেদ সম্পূর্ণ রূপে দূর করিতে সাহস করিবেন না। কিন্তু একই জাতির যে বিভিন্ন শাখা আছে, তাহাদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন, বিলাত প্রত্যাগত লোকদিগকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে সমাজে গ্রহণ প্রভৃতি সংস্কার কার্য্য করিতে পারেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন করাও সমাজ-সংস্কার-সমিতির কর্ত্তব্য। বঙ্গীয় সমাজ-সংস্কার-সমিতি।

কেরল প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীরূপে অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন (৭ই মে, ১৯২৩)

"দক্ষিণ ভারতের নিষ্ঠুর এবং ভীষণ সমস্যা—অস্পৃশ্যতার বিষয় আজ আপনাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আপনারা আপনাদের অন্ত্যজ

ভাইদের এক সঙ্গে বসিতে দিয়া নিজেরাই সেই সমস্যার সমাধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজ যদি মহাত্মাজী দেখিতে পাইতেন যে, একই গৃহতলে নম্বুদ্রি, নায়ার ও নায়াদী একত্রে উপবেশন করিয়াছি, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন, একা মালাবারই ভারতের স্বরাজ আনয়ন করিবে। অস্পৃশ্যতার উপর তিনি কিরূপ জোর দিয়াছেন আপনারা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীমতী কস্তুরীবাই গান্ধি যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, তখন তাঁহার প্রধান প্রশ্ন—লক্ষ্মী কেমন আছে? আজ তাঁহারই শিক্ষার গুণে গর্ব্বিত নম্বুদ্রি ও বিনীত নায়াদী একত্রে উপবেশন করিয়াছে। মালাবারের শোচনীয় ব্যাপারের কথা মনে পড়িলে আমার চোখ ফাটিয়া জল আসে; তবুও এই সম্বন্ধে আমি একটী কথা বলিতে চাই। কতিপয় মুসলমানের দুষ্কার্য্যের জন্য এখানকার হিন্দু সমাজ বিশেষ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া আছে। মুসলমান দুর্ব্বৃত্তদিগের এই কার্য্যে ভারতের উক্ত সমাজের সমস্ত ধর্ম্ম গুরুরাই প্রতিবাদ করিয়াছেন। আর হিন্দুরাও এই বিষয়ে উদারতা প্রদর্শন করিতে পারিতেছে না বলিয়া মুসলমান ভ্রাতারাও ক্ষুব্ধ হইয়াছে।”

হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

পাঞ্জাবে বা যুক্ত প্রদেশে হিন্দুর গায়ের শক্তি মুসলমানের চেয়ে কম নয়, ওরাও ছাতুটাতু খায় কিন্তু হিন্দুই পড়ে মার খায়, তার কারণ হিন্দুদের সংহতি নেই মুসলমান মুসলমানের ডাকে সাড়া দেয়, হিন্দু দেয় না। মুসলমানের এই অরগেনাইজিং স্পিরিট কোথা থেকে এসেছে? তার ধর্ম্মই তাকে অরগেনাইজ করে। মুসলমানের ধর্ম্ম সাম্যবাদ-মূলক। মুসলমানে মুসলমানে যে সহানুভূতি তার সেংকশন বা বনিয়াদ মুসলমান ধর্ম্মে। হিন্দুর ধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ত্তমানে যাকে আমরা হিন্দুধর্ম্ম বলে বুঝি তা অরগেনেইজেসন এর পরিপন্থী। সাম্যবাদের উপর এ প্রতিষ্ঠিত নয়। সেদিন এক বন্ধু সীমান্ত প্রদেশের এক

গল্প বলছিলেন। আফ্রিদীরা প্রায়ই সীমান্তের ব্রিটিশ প্রজাদের উপর চড়াও ক'রে মেয়ে পুরুষ ধরে নিয়ে যায়। একবার একটি হিন্দুর মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েচে। যে বন্ধু এই গল্প বলেছিলেন তাঁর বাসা এই ঘটনাস্থলের অতি নিকটে ছিল। তিনি দেখলেন যে হিন্দু প্রতিবেশী কেউ মেয়েটিকে রক্ষা করবার জন্য অগ্রসর হ'ল না, তাতে তিনি একজন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, একি রকম? আপনারা যে টু শব্দটি করলেন না। তাতে ব্রাহ্মণ জবাব দিলেন, "উয়োঃত বেনিয়াকা লেড়কী।"

কবি বল্লেন এই ত হিন্দুর মন, মুসলমান কিন্তু কখনও এ রকম জবাব দেবে না।

অস্পৃশ্যতা দোষ

হিন্দুর অস্পৃশ্যতা শুধু দৈহিক নয়, তার চেয়ে প্রবল হচ্ছে নৈতিক অস্পৃশ্যতা। বাংলাদেশে দৈহিক অস্পৃশ্যতা হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ নেই কিন্তু নৈতিক অস্পৃশ্যতা খুবই আছে। যাতে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ সব বর্ণের মধ্যেই আছে। * * *

হিন্দুদের দুর্ব্বলতার কারণ মূলগত। হিন্দুসমাজ মানুষের সঙ্গে মানুষের জন্মগত ভেদ করে রেখেছে যার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেওয়া যায় না। জগতে কোন জাত উন্নতি কর্ত্তে পারে নি যারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে নিজেদের ধর্ম্মগত বা অভ্যাস-গত আচার ব্যবহার না পরিবর্ত্তন কর্ত্তে পেরেছে। কবে মনু-সংহিতায় সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করে গিয়াছে আর যতই অবস্থার পরিবর্ত্তন হউক না কেন তাই আকড়ে ধরে বসে থাকতে হ'বে, এ বিশ্বাস না বদলালে আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। অবশ্য সব জাতেরই কতকগুলি সংস্কার আছে এবং সংস্কার-গত আচার ব্যবহার আছে যার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ দেখানো যায় না। কিন্তু উন্নতিশীল জাতি মাত্রেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সংস্কার ও আচার ব্যবহার উন্নতির

পরিপন্থী তা ত্যাগ করতে পেরেছে। জগতে আমরা অর্থাৎ কেবল হিন্দুরাই তা ত্যাগ কর্ত্তে পারি নি। তাই আমরা মানুষে মানুষে জন্মগত বা অনৈসর্গিক প্রভেদ, যা হয়ত কোনো কালে, কোনোও উপযুক্ত কারণে বা নিষ্কারণে করা হয়েছিল, তা এখনও বজায় রাখতে চাই। বাস্তবিক ভগবান মানুষে মানুষে এমন কোন ভেদ করে দেন নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সত্য সম্বন্ধ তার ব্যতিক্রম কোরে কখনও সত্যিকার মিলন গড়ে উঠতে পারে না।

হিন্দু মহাসভা

কবি বলেন যে "হিন্দু-মহাসভা" যদি হিন্দু-সমাজের কীটস্বরূপ, দৈহিক নৈতিক অস্পৃশ্যতা দূর কর্ত্তে পার্ত্তেন তা হলে, মুসলমানরা চটে গেলেও, কাজের মত এক কাজ হোতো।

ঘরের গলদ দূর কর্ত্তে পারলে অর্থাৎ হিন্দুদের মধ্যে যে অস্পৃশ্যতা (ফিসিকেল ও ময়্যাল) দোষ আছে তা নিরাকরণ কর্ত্তে পারলে হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠবে। শরীর আর শুধু মাংসপেশী ফোলাবার চেষ্টা কল্লে কিছু হবে না। মুসলমানও হিন্দুদের দেখাদেখি গায়ের জোর আরও বৃদ্ধি করবার চেষ্টা ক'রতে পারে। এ রকম চেষ্টাও বিপরীত চেষ্টা, কেবল পাপের পথে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকবে। তাতে ফল হবে কি?" কবি আবার বল্লেন যে "শারীরিক শক্তি মানুষ মাত্রেরই অর্জ্জন করা দরকার সেত চিরন্তন সত্য, কিন্তু আমাদের সমাজদেহের যে ব্যাধি তার কারণ নির্দ্দেশ করে তাই উৎপাটন করার চেষ্টা হচ্ছে গোড়ার কথা।" হিন্দু যদি বাঁচতে চায়, যদি মানব সমাজে অধঃপতিত অবস্থায় চিরদিন পড়ে থাকতে না চায়, তা হলে তাকে সঙ্ঘবদ্ধ হতেই হবে। কিন্তু হিন্দুদের এই সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা কি মুসল-মানরা সন্দেহের চক্ষে দেখবে না আর তার ফলে হিন্দু মুসলমানের অমিলের আর একটা কারণ কি বৃদ্ধি পাবে না?" —এ প্রশ্নের জবাবে কবি বল্লেন—"হাঁ, তা হবে বৈ কি? কিন্তু সে বিপদের আশঙ্কা আমাদের মেনে নিতেই হবে। মুসলমানের যে স্বাধীনতায়

আমরা বাধা দেইনি সে স্বাধীনতা আমাদেরও প্রাপ্য। তারা নিজেরা সংঘবদ্ধ হতে পারে তারা ইচ্ছামত হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করতে পারে আর তারা তা করেছে এবং এখনো করছে—আমরা তো কখনও বাধা দিতে দাঁড়াই নাই। আমরা যখন দিয়েছি, তখন তারাই বা সে স্বাধীনতা কেন আমাদের দেবে না ? আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে চাইলে তারা কেন তাতে বাধা দেবে ?"

কবি তারপর মালকানা রাজপুতদের শুদ্ধি ব্যাপার সম্বন্ধে বল্লেন—তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না, মুসলমান যে স্বাধীনতার দাবী নিজে করছে, ঠিক সেই স্বাধীনতা অপরকে দিতে কেন নারাজ ?

"কিন্তু—কবি তারপর বল্লেন—হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করা বড় কঠিন—যে সব বাধা বিপত্তি আছে তা অতিক্রম করা বড়ই শক্ত। সামাজিক ভেদ-নীতি হিন্দুকে মৃত্যুর মুখেই ঠেলে দিচ্ছে।

কবি তারপর বল্লেন আমি আমার জমিদারীতে দেখেছি হিন্দু প্রজা কোন-রূপ সংস্কারই বরণ করে নিতে পারে না কিন্তু আমার মুসলমান প্রজারা সহজেই সকল সংস্কার আয়ত্ত করে নিতে পারে। ফলে মুসলমান সংখ্যায় ক্রমই বেড়ে চলেছে আর হিন্দুর অস্তিত্বই লোপ হচ্ছে।

কবি তারপর হিন্দুদের সামাজিক কতগুলি ব্যবস্থার দোষ দেখিয়ে বল্লেন যে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি না হবার আরো কারণ হচ্ছে ওই সব সামাজিক ব্যবস্থা।

প্রায় ২ ঘণ্টা আলাপ করবার পর আমি কবির নিকট বিদায় গ্রহণ করি। বিদায় দেবার সময় কবি আমায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করতে বল্লেন আর বল্লেন যে দেশের নেতাদের সবখানি মন দিয়ে আজ এই সমস্যা সমাধানের উপায় স্থির করাই দরকার। শ্রীমৃণালকান্তি বসু (বিজলী)

• বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য এই তিন জাতি উচ্চ

জাতি' বলিয়া গণ্য। এই 'উঁচু জাতের' লোকেরা নিজেদের কৃত্রিম সামাজিক মর্য্যাদা ও গৌরবে ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। হিন্দুসমাজের তথাকথিত নিম্নজাতির লোকেরাও যে সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ, এমন কি অনেক স্থলে মেরুদণ্ড স্বরূপ, এ জ্ঞান তাঁহাদের নাই। আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার ফলে এই তিন জাতির হাতে নানা কারণে বহু ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কিন্তু এই উচু জাতের লোকেরা সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেন নাই। বরং তাঁহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্মৃতিশাস্ত্র ও দেশাচারের দোহাই দিয়া, তথাকথিত উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কৃত্রিম ব্যবধান গড়িয়া তুলিয়াছেন। নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে শিক্ষাও জ্ঞানবিস্তারের জন্য তাঁহারা কোন চেষ্টাই করেন নাই। সর্ব্ব প্রকার সামাজিক সুবিধা ও সুযোগ পাইয়া যাহাতে তাঁহারা নিজেদের ও হিন্দুসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারেন, উচ্চজাতির লোকেরা সে পক্ষে কোন উৎসাহ দেন নাই; এবং সর্ব্বোপরি তাহাদের মধ্যে কোন কোন জাতিকে "অস্পৃশ্য, জলানাচরণীয়" প্রভৃতি আখ্যা দিয়া পশুবৎ ঘৃণা করিয়া আসিতেছেন। ফলে হিন্দু-ব্যবসায়ী জাতিরা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে, কৃষক ও শ্রমিক জাতিরা ক্রমে ক্রমে হীনবল হইয়া পড়িতেছে এবং তাহাদের স্থান মুসলমান প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায়ের লোক, এমন কি বাঙ্গালার বাহিরের লোক আসিয়া অধিকার করিতেছে।

সমাজের প্রধান বন্ধন সংহতিশক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুসমাজে এখন তাহাই নাই। মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে উহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তাই বাঙ্গালার তথা ভারতের সর্ব্বত্র তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে; আর হিন্দুরা কেবল "ছুঁৎমার্গের" নাগপাশে বদ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিয়া মরিতেছে। সমাজের এই নিম্নবর্ণের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারই যে হিন্দুসমাজে বলক্ষয় ও ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ, একথা আজ বুঝিয়াও

কেহ বুঝিতে চাহিতেছে না। অথচ এই তথাকথিত "উচ্চজাতি" হিন্দুসমাজের কতটুকু অংশ? সমগ্র বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের লোকসংখ্যা প্রায় ২০৮ লক্ষ। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ১৩ লক্ষ, কায়স্থ ১২ লক্ষ, এবং বৈদ্য ১ লক্ষ—মোট ২৬-লক্ষ মাত্র, অর্থাৎ এই তিন জাতি একত্রে হিন্দু-সমাজের মাত্র শতকরা ১২।০ ভাগ। বাকী শতকরা ৮৭।০ ভাগ তথাকথিত "নিম্নবর্ণের" লোক। যে সমাজের মুষ্টিমেয় শতকরা ১২।০ ভাগ লোক, কতকগুলি কৃত্রিম দেশাচার ও প্রথার বলে সমাজের অপর ৮৭।০ ভাগ লোককে দাবাইয়া রাখিতে পারে, সে সমাজের কখনই মঙ্গল হইতে পারে না।

হিন্দু সমাজের অর্দ্ধেকের বেশী, এবারকার সেন্সাসে Depressed classes অর্থাৎ অস্পৃশ্য জাতি বা অবনত জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই সমস্ত জাতিদের মোট সংখ্যা ১ কোটী ১২ লক্ষেরও উপর। কোন্ কোন্ জাতি "অবনত" বা অস্পৃশ্য" বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তাহার একটা তালিকা দিতেছি।—বাওরী, বাগদী, ভুঁইমালী, ভুইয়া, ভূমিজ, চামার ও মুচি, চাষী কৈবর্ত্ত, ডোম, গাবে, হদি, হাজঙ, হাড়ি, জেলে কৈবর্ত্ত, কলু, কেওড়া, কায়রা, কান্তা, খণ্ডায়েত, খেন, কোচ, কৈরী, কোড়া, কুর্ম্মি, লোহার, মাল, মালো, মেচ, মুণ্ডা, নমঃশূদ্র, নুলিয়া, ওরাও, পাটনী, পোদ, পুণ্ডরী, রাজবংশী রাজু, সাওতাল, শুকালী, তিয়ার। ইহাদের মধ্যে নমঃশূদ্রদের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ এবং চাষী কৈবর্ত্তদের সংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ।

হিন্দু সমাজের অর্দ্ধাংশেরও বেশী এই বিরাট অবনত বা অস্পৃশ্যজাতি, সমাজপতিদের কাছে কি ব্যবহার পাইতেছে? দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারে কি ইহারা নিমগ্ন হইয়া নাই? ছুৎমার্গাবলম্বী উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যের ফলে, ইহারা কি দলে দলে মুসলমান ও খৃষ্টান হইতেছে না? মিশনরীরা স্থানে স্থানে মিশন খুলিয়া তাহাদের মধ্যে যেরূপভাবে শিক্ষা বিস্তার ও সেবাকার্য্য করিতেছেন, হিন্দুরা সেরূপ কিছু করিয়াছেন কি?

বাঙ্গালার যেখানে অনুন্নত জাতিরা একটু অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে, সেই খানেই 'উচ্চজাতিরা' মিলিয়া তাহাদের বাধা দিতেছেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলে, হদি জাতির আন্দোলনের বিরুদ্ধে তথাকার ব্রাহ্মণ জমিদারেরা যেরূপ বৈরভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া লজ্জায় ঘৃণায় মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সমস্ত হিন্দু—মুসলমান ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি যেটুকু শ্রদ্ধা দেখায়, স্বধর্ম্মীদের প্রতি তাহাও দেখাইতে চায় না। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে, ঢাকার স্কুল কলেজের হোষ্টেলে উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাত্রেরা মুসলমানদের সহিত এক ঘরে থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দু নমঃশূদ্রদের সঙ্গে এক ঘরে থাকিতে গেলেই তাহাদের জাতি যায়। আরও দুঃখের কথা এই যে' 'উচ্চজাতিদের' কুদৃষ্টান্তের প্রভাব সমাজেব সর্ব্ব-স্তরে সংক্রামিত হইতেছে। প্রত্যেক "জাতিই", তার চেয়ে ঈষৎ 'অনুন্নত' অন্য জাতিকে দাবাইয়া রাখিতে ব্যস্ত। নিজেরা যে অধিকার চায়, অন্যকে তাহা দিতে রাজী নয়। সেন্সাসের রিপোর্টে লিখিত আছে—লোক গণনার সময় প্রত্যেক জাতিই নিজেদের বড় করিতে এবং অন্যকে "হীন ও ছোট" বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। চাষী-কৈবর্ত্তেরা নিজেরা মাহিষ্য হইবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু জেলে, কৈবর্ত্ত পাটনী প্রভৃতিকে ঐ উপাধি ব্যবহার করিতে কিছুতেই দিবে না। আনন্দবাজার ১৬।৮।৩০

মধ্যযুগে যখন ভারতবর্ষ বিদেশীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছিল, হিন্দু-সমাজ ও ধর্ম্ম প্রবল বহিঃশক্তির সংঘর্ষে টলমল করিতেছিল, তখন হিন্দুব সমাজপতি ও ধর্ম্মাচার্য্যেরা এক নূতন অস্ত্র অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই অস্ত্রের নাম'কমঠব্রত'। কূর্ম্ম যেমন আপনার ইন্দ্রিয়বর্গকে সংহৃত করিয়া, বহিঃশক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, মধ্যযুগের বিশাল হিন্দুসমাজও তেমনি নিবৃত্তির মার্গ অবলম্বন করিয়া আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাকে রক্ষণশীলতা বলিতে হয় বল বা গোঁড়ামী

বলিতে হয় বল। মধ্যযুগের ধর্ম্মাচার্য্য ও স্মৃতিকারেরা এইরূপে শক্তিসংহরণ করিয়াই জীবনসংগ্রামে বাঁচিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। এ নীতি হয়ত সময়োপযোগী হইয়াছিল, কেননা, বহিঃশত্রু যখন প্রবল পরাক্রান্ত, তখন সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় লওয়াও রণনীতির একটা অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হয়।

কিন্তু এই কমঠব্রতের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু সমাজের মধ্যে নানা ধ্বংসকর ব্যাধির উৎপত্তি হইয়াছে। "ছুঁৎমার্গ" তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহা সমাজ-দেহে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ বিশাল হিন্দু সমাজের মধ্যে অস্পৃশ্য ও জলাচরণীয় বলিয়া প্রায় এক চতুর্থাংশ লোককে আমরা নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিয়াছি। তাহারা তথাকথিত উচ্চবর্ণের হাতে মানুষের সম্মান ও মর্য্যাদা পায় না, তাহাদের মঙ্গলের জন্য উচ্চবর্ণের লোকেরা কোন চিন্তাই করে না। তাহারা দুঃখ-দৈন্য পীড়িত, অ-শিক্ষা কু-শিক্ষা নিমগ্ন যুগব্যাপী কুসংস্কারের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। হিন্দুসমাজের সকল শুভ চেষ্টা ও আন্দোলনে তাহারা পাষাণ-ভারের ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। এমন অস্বাভাবিক সমাজ-বিন্যাস কি কখন টিকিতে পারে? হিন্দুর সমাজে তাই ভাঙ্গন ধরিয়াছে। তথাকথিত "অস্পৃশ্য ও জলাচরণীয়েরা" দলে দলে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া মানুষের মর্য্যাদা লাভের চেষ্টা করিতেছে। খৃষ্টান মিশনরী প্রভৃতির প্রতি বিরূপ হইলে তো চলিবে না। তাঁহারা হিন্দুসমাজের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়াই আপনাদের প্রচারকার্য্য করিতেছেন। আনন্দবাজার ৪।৫।৩০

অস্পৃশ্যতা প্রসঙ্গে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বে ক্রনিকল পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অস্পৃশ্যতা ও হিন্দু-মুসলমান একতা সম্বন্ধে উক্ত প্রতিনিধির নিকট তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে উহার সার মর্ম্ম প্রদান করা গেল।

স্বামীজী বলিলেন,—তাঁহাদের জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি হিন্দুদিগের

মধ্যে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য নিয়োগ করিবেন। অস্পৃশ্যতা রূপ দোষ হিন্দুদিগের নামে কলঙ্ক লেপন করিতেছ। সমগ্র ভারত তাঁহাদের এই পাপের ফল ভোগ করিতেছে। যখনই আমাদের কোনও নেতা স্বরাজ্যের কথা উত্থাপন করেন, এই অস্পৃশ্যতার কথা বলিয়া তাঁহাদের মুখ বন্ধ করা হয়। যাহারা নিজেদের স্বজাতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে পদদলিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা বিদেশীর অধীনতার অভিযোগ করিতে পারে না। তাঁহার মতে যে পর্য্যন্ত ভারতের ৭ কোটি নরনারী নিজেদের স্বজাতীয়ের পদতলে নিপীড়িত হইবে সে পর্য্যন্ত জাতীয় মহাসভার গঠনমূলকই হউক আর ধ্বংসমূলকই হউক, কোনওপ্রকার কার্য্যপদ্ধতিই সফল হইবে না।

অস্পৃশ্য জাতিরা কে ?

প্রশ্ন উঠে—এই অস্পৃশ্য জাতিরা কে ? জুলুল্যাণ্ড হইতে তাহারা ভারতে আসে নাই অথবা নরকের মধ্য হইতেও তাহাদের উদ্ভব হয় নাই ; আর স্বর্গ হইতেও যে তাহারা পতিত হয় নাই, ইহাও ঠিক ; কেন না তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থাই উহার পরিচয় দেয়। নিরপেক্ষভাবে একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়, এই অস্পৃশ্যদেব সকল সম্প্রদায় এমন কি বেদীয়া, ভাঙ্গিয়া পর্য্যন্ত তথাকথিত উচ্চ ত্রিবর্ণের মত একই গোত্র হইতেই উদ্ভূত। খুব সম্ভব নৈতিক চরিত্রহীনতাই ইহাদেব সামাজিক অবনতির কারণ। তাহারা যদি তাহাদের বর্ত্তমান জীবনধারা ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাদের পূর্ব্ব সামাজিক অবস্থা ফিরিয়া পাইবার কোন অন্তরায় আসিতে পারে না। সেই সোজা সত্যটা হিন্দুসমাজ এতদিন উপেক্ষা করিয়া আসিত মহাপ্রভু চৈতন্য, কবির, নানক, সাধু গুরু গোবিন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই পাপ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টাই একরকম বিফলে গিয়াছে। অতঃপর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সর্ব্বমানবের ক্ষমতা প্রচাব করেন। তাঁহার বার্ত্তা শ্রবণে সমগ্র আর্য্যসমাজের কর্ত্তব্যবুদ্ধি

জাগরিত হয় যে সময় উক্ত মহাপুরুষেরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, সেই সময়ে হিন্দুরা খৃষ্টান ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়া পড়িতেছিলেন।

অস্পৃশ্য জাতিকে উন্নয়ন অতীব গুরুতর কার্য্য। এই কার্য্যের জন্য প্রথম প্রয়োজন ২৫০ জন প্রচারক সংগ্রহ করা। যে সমস্ত স্থানে অস্পৃশ্য জাতির সংখ্যা বেশী সেই সব স্থানে ইহাদিগকে প্রেরণ করা হইবে। ইঁহারা একদিকে সেই সব জাতিকে শরীর ও মনে পবিত্র হইতে শিক্ষা দিবেন, অপর দিকে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা যাহাতে ইহাদিগকে সামাজিক সমানাধিকার প্রদান করে তাহার জন্যও চেষ্টা করিবেন। এই সব অস্পৃশ্য জাতির লোককে কাজ দেওয়ার জন্য এবং ইহাদের সন্তান-সন্ততিকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কতকগুলি শিল্প-বিদ্যালয় খুলিতে হইবে।

এই কার্য্যের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রাথমিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অনতিবিলম্বে আড়াই লক্ষ টাকার প্রয়োজন। অবশিষ্ট অর্থ দিয়া একটী স্থায়ী ভাণ্ডার প্রস্তুত করিতে হইবে। হিন্দুসংগঠনের বিরুদ্ধ সরস বাদীরা ৮ কোটী লোকের জন্য ৮ কোটী টাকাই ব্যয় করিতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মরক্ষার্থ মাত্র এক কোটীর চতুর্থাংশ প্রার্থনা করিতেছেন।

মহাত্মাজী ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পুণা সেসুন হাঁসপাতালে গমন করেন। সেখানে তাঁহার সঙ্গে স্বামিজী ১৫ মিনিট কাল আলাপ করেন।

সেই অপরাহ্নে স্বামিজী এক সাধারণ সভায় শুদ্ধি ও সংগঠন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি কংগ্রেস নেতাগণের সর্ব্বপ্রকার যুক্তি খণ্ডন করেন, তাহারা যেন একতাবদ্ধ হইয়া অন্ত্যজ জাতিকে তাহাদের মধ্যে তুলিয়া লয়। সভায় প্রায় ৫০ হাজার লোক উপস্থিত ছিল।

বোম্বাইয়ে সভা

২৬শে তারিখে বোম্বাই পৌঁছিয়া তিনি এক বিরাট জনসভায় যোগ দান করেন। তিনি মৌলানা মহম্মদ আলীর সভাপতির অভিভাষণ হইতে দেখাইয়া দেন, যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অস্পৃশ্য সম্প্রদায়গুলিকে যদি জাতে তুলিয়া না লয়, তাহা হইলে মুসলমান ও খৃষ্টানরা তাহাদিগকে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ফেলিবে। অস্পৃশ্য জাতিদিগকে বিদ্যালয়, কূপ ও মন্দিরে সমান অধিকার দেওয়া হয়, সে জন্য তিনি হিন্দুদিগকে বিশেষ অনুরোধ করেন।

ছুঁৎমার্গ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী—

নির্ভীক সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নাম বাঙ্গালায় অপরিচিত নহে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় হইতে ইনি রাজনীতি ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন। আমলাতন্ত্র এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেশ সেবার জন্য পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করেন নাই। গত ৪ বৎসর কাল অধ্যবসায়ের সহিত কর্ম্ম করিয়া সম্প্রতি তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি হিন্দুসমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের সমগ্র হিন্দু জাতির মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৭ কোটী মানব—উচ্চবর্ণের জাতিসকলের নিকট অস্পৃশ্য। এই শোচনীয় বৈষম্য বিদূরিত না হইলে স্বরাজ লাভ অসম্ভব —শ্রদ্ধানন্দজীর এই কথা অর্থের খাতিরে অনেকেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি দৈনন্দিন জীবনে ঐ সাত কোটি মানুষকে মানুষের মত ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই জাতির প্রকৃত কল্যাণকামী। পণ্ডিত মালব্যজী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতির উদ্যম, অনেকাংশে সফল হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গলার হিন্দুর-সমাজ জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সামাজিক কুপ্রথাগুলি পরিহার কল্পে এক তীব্র আন্দোলন জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারেন, এমন শক্তিমান তো বর্ত্তমানে কাহাকেও দেখা যাইতেছে না। অথচ ভেদ দ্বন্দ্বে, হিন্দু সমাজ রসাতল যাইতে বসিয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দু

ছত্রভঙ্গ হইয়া মরিবে—না—সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাঁচিবে,—বাঙ্গালী প্রধানেরা অগ্রসর হইয়া এই সমস্তার মীমাংসায় আর কত কালক্ষেপ করিবেন ?

"হিন্দুসমাজে শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের লোক আছে। কিন্তু মাদ্রাজের ব্রাহ্মণগণ বহু কাল হইতে সে প্রদেশে 'পঞ্চম' নামক আর এক বর্ণের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। অনেকেই জানেন সামাজিক অত্যাচারে মাদ্রাজ আছেন ভারতে শীর্ষস্থানীয়। সেখানকার স্থায়নিষ্ঠ (?) ব্রাহ্মণগণ তথা কথিত সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর লোক দিগকে চতুর্ব্বর্ণের শূদ্র আখ্যা দিতে না পারিয়া 'পঞ্চম' বর্ণের উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই 'পঞ্চম' বর্ণের লোক দূর হইতে ও কোন ব্রাহ্মণের অগ্নিপক্ক খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উহা অপবিত্র হইয়া যায়।

শ্রীযুক্ত গান্ধি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ ভ্রমণ কালে 'পঞ্চম'দের নিকট এক অভিনন্দন পত্র পাইয়া বলেন :—

সৌভাগ্য বশতঃ পঞ্চমভ্রাতাদের নিকট আমি এক অভিনন্দন পত্র পাইয়াছি। আমি শুনিলাম পঞ্চমেরা অপর শ্রেণীর ব্যবহৃত জলাশয়াদি হইতে পানীয় জল লইতে পারে না, তাহারা জমাজমি ক্রয় করিতে অথবা উহার মালিক হইতে পারে না। সরকারী আদালতে উপস্থিত হওয়া তাহাদের পক্ষে শক্ত—সেখানে যাইতে তারা সংকুচিত হয়, ভয় পায়, তাদের এই সঙ্কোচ ও ভয়ের জন্য দায়ী কে ? এজন্য তথা কথিত উচ্চ শ্রেণীর লোকেই দায়ী। আমরা কি এই অবস্থা চিরস্থায়ী করিব ? হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা করিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি কাহাকেও 'অস্পৃশ্য' করিয়া রাখা ধর্ম্ম-বিগর্হিত। যদি কেহ আমাকে বুঝাইতে আসেন ইহা হিন্দুধর্ম্মের অত্যাবশ্যকীয় অংশ, তবে আমি নিজেকে হিন্দুধর্ম্মের প্রকাশ্য বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিব। ব্রাহ্মণগণ যদি পারিয়াদের সহিত মিশেন, তবে অপর হিন্দুরা তাদের অনুসরণ করিবে।"

আর এক স্থলে মহাত্মা গান্ধি বলিতেছেন :—

"এত শিক্ষা ও জ্ঞান-বিস্তার সত্ত্বেও দেশের 'স্পর্শদোষ' লোপ পাইতেছে না কেন? শিক্ষার প্রভাবে আমরা বুঝিয়াছি যে 'শুচি ব্যাধি' ভয়ানক সামাজিক পাপ। কিন্তু আমরা ভয়ে জড়সড় বলিয়া পরিবার মধ্যে এই মত প্রচার করিতে পারি না। প্রাচীন রীতি নীতি, ও পরিবারের লোকের প্রতি আমাদের অন্ধ অনুরাগ আছে। আপনারা হয়ত বলিবেন, পিতামাতা অন্যায় করিলে তাহার প্রতিবাদ সন্তানে কিরূপে করিবে?' প্রহ্লাদের কথা মনে করুন। পিতা হরির নাম করিতে নিষেধ করিলেও, প্রহ্লাদ এই অন্যায় আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া পিতৃদেবের পবিত্র সন্নিধানে উপস্থিত থাকিয়া হরিধ্বনি দ্বারা রাজপুরী মুখরিত করিয়াছিলেন। আমরাও এইরূপে পূজনীয় পিতা-মাতার পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইব, পুত্রের মুখের প্রতিবাদ শুনিয়া যদি কোন পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহাতে দুর্দৈব মনে করিব না। আমরা মান্ধাতার আমল হইতে অনেক সামাজিক পাপের আশ্রয় দিয়া আসিতেছি। তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আত্মনিগ্রহ—আত্মবলিদান চাই। সকলকেই কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে।"

নাপিত ও চিকিৎসকের ব্যবসা আমার নিকট সমান গৌরবজনক মনে হয়। পৃথিবীর কোন মানুষ হীন অথবা অস্পৃশ্য হইতে পারে না ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে হইবে তার পর পরিবার ও সমাজের মধ্যে এই ভাবকে প্রচার করিতে হইবে।"

উদ্ধৃত কথার উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক। তবে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ (?) বর্ণের লোকদের প্রতি আমার নিবেদন তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের অনুষ্ঠিত পাপের জন্য সমাজে যে বৈষম্য দেখা দিয়াছে, সামাজিক অত্যাচারের ফলে কোটী কোটি অমৃত সন্তানের যে মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আত্মবিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে, অবিলম্বে তাঁদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করা উচিত।

একটা কথা আছে অবস্থা বিশেষে হিংস্রক সর্পই সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিষ উঠাইয়া লয়—আশা করা যায় দেশের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সেইরূপে সমাজ শরীরের বিষ উঠাইয়া লইবেন। শ্রীবিনয়কৃষ্ণসেন বি, এ প্রতিজ্ঞা ১৪।২।১৩২৬

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধি অন্য এক স্থানে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিয়াছেন :—

অস্পৃশ্যতা বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের দুরপনেয় কলঙ্ক। আমি বিশ্বাস করি না যে ইহা আবহমান কাল হইতে প্রচলিত আছে। আমার বোধ হয় যখন হিন্দুধর্ম্ম অবনতির নিম্নতম সোপানে পতিত হইয়াছিল, তখন এই সর্ব্বনাশ-কারী, মনুষ্যত্ব-হারী, কৃত দাস-কারী স্পর্শদোষ রূপ ব্যাধি সমাজ দেহে প্রবেশ করিয়াছিল এবং এখন পর্য্যন্ত উহা রহিয়া গিয়াছে। ইহাকে আমি ভগবানের অভিশাপ মনে করি। যতদিন পর্য্যন্ত ইহা আমাদের মধ্যে থাকিবে, ততদিন সকলের মনে রাখিতে হইবে এই পবিত্র ভারত ভূমিতে আমরা যত প্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করি না কেন, তাহা এই অমোচনীয় মহা পাপের ফল—যাহা আমরা প্রত্যহ ভোগ করিতেছি। যে কোন বিশেষ ব্যবসা করে বলিয়া, কাজ করে বলিয়া কাহাকেও যে অস্পৃশ্য মনে করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না। শিক্ষিত ভারতবাসীরা যদি এই স্পর্শ দোষের হাত হইতে মুক্ত হইতে না পারেন, তবে তাঁহারা শিক্ষা না পাইলেই ভাল হইত। লোক মান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় অনুন্নত সমাজের উন্নয়ন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে কতকগুলি মানুষকে পশুর মত করিয়া রাখা কখনও হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু শাস্ত্রের অভিপ্রেত নয় এবং এই আন্দোলনে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

গত ১৯১৬ খৃঃ অব্দে বরোদাতে বরোদার গাইকোয়াড়ের সভাপতিত্বে অখিল ভারতীয় অস্পৃশ্যোদ্ধার সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভাতে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক মারাঠি ভাষাতে একটী বক্তৃতা দান করেন।

তাঁহার জনৈক বন্ধু এই বক্তৃতাটী নোট করিয়া রাখিয়াছেন। সম্প্রতি বেনারসের "আজ" পত্রে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ বিষয়ে লোকমান্য তিলকের মতামত কি ছিল তৎসম্বন্ধে পাঠকের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাহার ভাবানুবাদ প্রদান করিলাম। লোকমান্য বলেন "অস্পৃশ্যতা সমস্যা রাজনীতি ও সমাজ এই উভয় দিক হইতেই বিশেষ আলোচ্য। শীঘ্রই উভয় ক্ষেত্র হইতে উহার দূরীকরণ একান্ত আবশ্যক। একজন মানুষ অন্যের কাছে অস্পৃশ্য হইতে পারে উহার তাৎপর্য্য কি আমি তাহা বুঝিতে পারি না। কোনও শাস্ত্রে এই বিষয়ে কোন বিধান নাই। অন্য ধর্ম্মী এবং অন্য দেশবাসীর সঙ্গে আমরা অস্পৃশ্যদের অপেক্ষা ভাল ব্যবহার করি। অথচ দেশবাসীকে দূরে সরাইয়া রাখি। এই দোষ সমাজ হইতে দূর করা একান্ত কর্ত্তব্য। পেশোয়াদের সময়ে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের ভিতর এই দোষ ছিল না। বর্ত্তমানে উহার এত বাড়াবাড়ি জাতীয় অধঃপতনের চিহ্ন। যুদ্ধে অথবা জাতীয় উৎসবে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য নাই। আমাদিগকে উহাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কাজ করিতে হইবে এবং মন হইতে ভেদ সম্পূর্ণ দূর করিতে হইবে। অন্ত্যজকে ছুঁইলে পাপ হয় এই কুবুদ্ধি আমাদের ত্যাগ করিতে হইবে। উচ্চ নীচ এই ভাব আমাদের যতদিন দূর না হয় ততদিন আমাদের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

অনেকে আমাকে বলেন যে, আমি কেন অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে মন দিতেছি না। তাঁহাদের প্রতি আমার এই উত্তর যে সবদিকে দৃষ্টি রাখিতে আমি অসমর্থ। তবে এই কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি এই বলিতে পারি যে কয়েকবৎসর পূর্ব্বে গণপতি উৎসবে একজন চর্ম্মকারকে অনেকে যোগদান করিতে বাধা দিয়াছিলেন। আমি উহা অবগত হইয়া তাহাকে আহ্বান করি এবং আমার বাড়ীতে তাহার মূর্ত্তি রাখিতে বলি। আনন্দের বিষয় যে এই জন্য কেহ আমাকে পতিত করিতে

চেষ্টা করেন নাই। তেলীগাও যে এক কাচের কারখানা আছে উহাতে আমি সব বর্ণের লোক নিযুক্ত করিয়াছি। যখন একজন শ্বেতাঙ্গ আমাদের কাছে আসে তখন আমরা কখনও তাহাকে জিজ্ঞাসা করি না যে সে স্পৃশ্য কি অস্পৃশ্য। আমরা যদি জাতীয় উন্নতি চাই তবে সকলকে মিলিয়া মিশিয়াই কাজ করিতেই হইবে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কার্য্যে উহাদিগের সাহায্য লইতে হইবে—উহা দিগকে অবজ্ঞা করিলে দেশের সমূহ ক্ষতি হইবে।

আমি স্বয়ং কখনও এই প্রকার ভেদবুদ্ধি মানি না। আমার বাড়ীতে অন্ত্যজ জাতির প্রবেশাধিকার আছে, অনেক সময়ে আমি তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া চলি এবং আমি যে বিছানায় বসি তাহাতে উহাদিগকে বসিতে দেই।

আজ সমাজের ভিতর অস্পৃশ্যতা দারুণ ব্যাধিরূপে বর্ত্তমান আছে। এই রোগ দূর করাতেই আমাদের ধর্ম্ম লাভ হইবে। আমি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনে সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল। আমার আশা হয় যে শীঘ্রই সমাজ হইতে এই ব্যাধি দূর হইবে।"

রাজনীতি ও সমাজনীতি।

আমাদের দেশে—ভারতবর্ষে—পরাধীন জাতি আমরা রাজনীতির চর্চ্চা করি, সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার প্রার্থনা করি, তাহার জন্য অন্তরতম ইচ্ছার সহিত সাধনা করি। কিন্তু আমাদের সমাজে—ভারতবর্ষীয় সমাজে সাম্য কোথায়, স্বাধীনতা কোথায়, মৈত্রী কোথায়? হিন্দুসমাজ জাতিভেদের কঠোর নিষ্পেষণে জর্জ্জরিত, শূদ্র স্বার্থপর ব্রাহ্মণের চর্ম্ম-চটিকার তলদেশে ধূলিমলিন অবস্থায় পতিত; অতএব সাম্য কোথায়, স্বাধীনতা কোথায়? ব্রাহ্মণ শূদ্রকে দাস জাতি বলিয়া ঘৃণা করে, তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা দূরে থাকুক্ তাহাকে স্পর্শ করিলে নিজেকে অপবিত্র ও স্নানার্হ মনে করে, অজ্ঞ ও অন্ধস্পর্দ্ধায় স্ফীত হইয়া মানুষকে অবমাননা করিয়া নিজেরই

মনুষ্যত্বের অবমাননা করে। অতএব সাম্য কোথায়? স্বাধীনতা কোথায়? মৈত্রী কোথায়? রাজনীতিতে আমরা, ভারতবর্ষের কৃষ্ণচর্ম্মা শূদ্র আমরা, ইউরোপের শ্বেত ব্রাহ্মণের সমান স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য আন্দোলন করিতেছি, তাহারা আমাদিগকে ঘৃণা অবজ্ঞা করে এজন্য তুমুল প্রতিবাদ করিতেছি, সাম্য এবং মৈত্রীর কামনা করিতেছি কিন্তু আমাদের ভিতরকার অবস্থা দেখিতেছি কি? কৃষ্ণচর্ম্মা ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচর্ম্মা শূদ্রকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, তাহার প্রতিকারে আমরা যত্নবান হইয়াছি কি? অতএব আমাদের সাধনায় আন্তরিকতা, কামনায় সত্যের প্রভাব আকাঙ্ক্ষায় প্রাণের ছাপ কোথায়? এক শ্রেণীর লোকে, অর্থাৎ স্পষ্ট ভাষায়, সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার শত্রু, জাতি ও শ্রেণীভেদের সমর্থক স্বার্থান্ধেরা বলিয়া থাকেন রাজনীতি ক্ষেত্রের সাম্য ও স্বাধীনতার সহিত সমাজের সাম্যের সম্বন্ধ কি? জাতি ও শ্রেণী ভেদ অটুট অবস্থায় রাখিতে আপত্তি কি? অর্থাৎ ইঁহারা বলিয়া থাকেন রাষ্ট্রীয় সাম্যের সহিত সামাজিক সাম্যের সম্বন্ধ নাই। এ দুইটি জীবন সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। কিন্তু প্রকৃত কথা কি তাই? তুমি ব্রাহ্মণ, শূদ্রের প্রভু ব্রাহ্মণ, শূদ্রের ঘৃণা ও অবজ্ঞাকারী ব্রাহ্মণ, তুমি কেমন করিয়া একই প্রকার রাষ্ট্রীয় অধিকার পরিচালনা করিবে? রাজনৈতিক সভায় কেমন করিয়া তুমি শূদ্রের সহিত একাসনে বসিবে? কেমন করিয়া তোমার মতে যে নীচ এবং অস্পৃশ্য তাহার সহিত—প্রভু ও দাসরূপে নহে—বন্ধু ও সখারূপে তর্ক ও আলোচনা করিবে? গর্ব্বিত তুমি, দর্প ও দম্ভে স্ফীত তুমি, মানুষের অধিকার হরণকারী দস্যু তুমি, কেমন করিয়া তাহা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়? বাটীতে বসিয়া যাঁহাদিগকে তুমি কুকুর বা তদপেক্ষাও অধম মনে করিবে, রাজসভায় গিয়া কিরূপে তুমি তাঁহার সহিত সমান অধিকার বিশিষ্ট সখা ও সহচররূপে ব্যবহার করিবে? ফলতঃ সমাজনীতির সঙ্কীর্ণতা ও মিথ্যাভাব অটুট রাখিয়া রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে সাম্যমৈত্রী ও স্বাধীনতার

ভাব জাগরিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ করিতে চেষ্টা করার ন্যায় ভণ্ডামী আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব আমাদের রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের আধুনিক ভারতবর্ষীয় সমাজের সংস্কার সাধনে ব্রতী হওয়া উচিত। সমাজের ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত অধিকার যাহা দস্যু দানবের কুক্ষিগত হইয়া রহিয়াছে তাহাকে পুনরায় যেনতেন প্রকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—মনুষ্যত্বকে আবার মনুষ্যত্বের আসনে বসাইয়া শ্রদ্ধার কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতে দেশের লোককে শিখাইতে হইবে। তবেই রাজনৈতিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটিবে, তবেই দেশ প্রেমিকের স্বপ্ন সত্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশ্বের ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে। (মোহাম্মদী।)

এদেশের কোটি কোটি লোক নিরক্ষর। মানুষ শিক্ষার অভাবে—মানাপমানবোধ হইতে বঞ্চিত হইয়া পশু পক্ষীর মত জীবন যাপন করিতেছে লেখা পড়া জানিলে নিম্ন শ্রেণীর লোক সামাজিক সাম্য সম্বন্ধে নূতন আদর্শ প্রাপ্ত হইবে। একথা সত্য ; এবং ইহাতে উপকার বই অনিষ্ট হইবে না। তোমরা উচ্চ শ্রেণীর কয়েক জন লোক কোটি কোটি মানব সন্তানকে সমাজের নিম্নস্তরে স্থান দিয়াছ, তাহাদিগকে শিক্ষা ও সভ্যতায় বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ, তাহাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে দেও নাই, আজ তাহাদের চক্ষু ফুটিয়াছে, আজ তাহারা উন্নত হইতে চাইতেছে, শিক্ষা পাইলে তোমাদের অন্যায্য দাবী তাহারা সহ্য করিবে না। যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন হইবেই হইবে। অশিক্ষিত দুর্নীতি-পরায়ণ ব্রাহ্মণ সমাজের নিম্নস্তরে যাইবেন ; আর "চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ" এই বাক্যের স্বার্থকতা হইবেই। নিরক্ষর ২৮৷৷ কোটি লোক জাগিয়া উঠিবে ; সমাজের পুনর্গঠন হইবে, যোগ্য যে, সে উচ্চ স্থান পাইবে ; জোর করিয়া অস্বাভাবিক উপায়ে তাহা রোধ

করা যাইবেনা। রোধ করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ অন্যায়। তোমরা কংগ্রেসে কনফারেন্সে ইংরেজের সমান অধিকার দাবী করিতেছ, তোমরা দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত কৃষ্ণের প্রভেদ তুলিয়া দিতে চাহিতেছ, আর তোমাদের অনুন্নত ভ্রাতাদিগকে মস্তক তুলিতে দিতেছনা, এ কি লজ্জার কথা।
৺শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত "সমাজ সংস্কার ও জাতীয় সাধনা" (সঞ্জীবনী।)

কেবল সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ ও তদিতর উচ্চ সমাজ বলিয়া নহে। আমাদিগের চারিদিকে যে সকল ডিপ্রেস্‌ড্‌ ক্লাস—নিগৃহীত সম্প্রদায় রহিয়াছে তাহাদিগেব প্রতিও সহানুভূতি দেখাইতে হইবে—নিরপেক্ষভাবে ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া তাহাদিগের জাতীয় ও সামাজিক উন্নতির সহায় হইতে হইবে। কাহাকেও এখন নীচ বা হীনভাবে দেখিবার সময় নয়, এখন ভারতের উচ্চ নীচ সকল জাতির হৃদয়ে জাতীয় উন্নতির জন্য জ্বালাময়ী আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, শান্তিপ্রিয় ন্যায়পর বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের কৃপায় সকলেই এখন স্ব স্ব সামাজিক অবস্থা ভাবিবার ও উন্নত করিবার শুভ অবসর পাইয়াছে। এখন তাঁহাদের অনুকূল স্রোতের গতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যিনি সেই কালস্রোতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন, তাঁহার যে সেই উদ্যম বৃথা ও ভস্মে ঘৃতাহুতি হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ কারণ আমি মনে করি, সমস্তটা না হউক, যাহাতে তাঁহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম কতকটা সিদ্ধ হয়, তৎপ্রতি আমাদেব সহানুভূতি প্রদর্শন একান্ত কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সভার সভাপতি দিনাজপুরের মহারাজার ইংরাজী বক্তৃতার অনুবাদ। আনন্দ বাজারও বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ১৭।১।১৩২১

কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—
"এত নিষ্ঠুর জবর দস্তি দ্বারা যাদের অতি সামান্য খাওয়া ছোঁওয়ার অধিকার পর্য্যন্ত পদে পদে ঠেকান হয় এবং সেটাকে যারা কল্যাণ বলিয়াই মানে,

তারা রাষ্ট্র ব্যাপারে অবধি অধিকার দাবি করিবার বেলায় সঙ্কোচ বোধ করে না কেন ?"

রবীন্দ্রনাথ, সে দিন "ধর্ম্মের অধিকার" নামক প্রবন্ধে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের তীব্র ঝঙ্কারের সহিত বলিয়াছেন—"তুমি লোক সমাজ, তুমি লৌকিক ব্যবহারেও আপনাকে সামলাইতে পার না, কত তোমার বিকৃতি, কত তোমার প্রলোভন, তুমিই তোমার অত্যাচারের লাঠিটাকে ধর্ম্মের নামে গিল্টি করিয়া ধর্ম্মরাজের স্থান জুড়িয়া বসিতে চাও! তাই করিয়া শত শত বৎসর ধরিয়া এত বড় একটি সমগ্র জাতিকে, তুমি মর্ম্মে মর্ম্মে শৃঙ্খলিত করিয়া, তাহাকে পরাধীনতার অন্ধকূপের মধ্যে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছ—তাহার আর উদ্ধারের পথ রাখ নাই! যাহা ক্ষুদ্র, যাহা স্থূল, যাহা অসত্য, যাহা অবিশ্বাস্য তাহাকেও দেশ-কাল-পাত্র-অনুসারে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া কি প্রকাণ্ড, কি অসঙ্গত, কি অসংলগ্ন জঞ্জালের ভয়ঙ্কর বোঝা মানুষের মাথার উপরে শত শত বৎসর ধরিয়া চাপাইয়া রাখিয়াছ। সেই ভগ্ন-মেরুদণ্ড নিষ্পেষিত-পৌরুষ নতমস্তক মানুষ প্রশ্ন করিতেও জানে না, প্রশ্ন করিলেও তাহার উত্তর কোথাও নাই, কেবল বিভীষিকার তাড়নায় এবং কাল্পনিক প্রলোভনের ব্যর্থ আস্ফালনে তাহাকে চালনা করিয়া যাইতেছে, চারিদিক হইতেই আকাশে তর্জ্জনী উঠিতেছে এবং এই আদেশ নানা পরুষকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, যাহা বলিতেছি তাহাই মানিয়া যাও, কেন না তুমি মূঢ়, তুমি বুঝিবে না; যাহা পাঁচজনে করিতেছে তাহাই করিয়া যাও, কেন না তুমি অক্ষম, সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সহিত তোমাকে আপাদ মস্তক শতসহস্র সূত্রে একেবারে বাঁধিয়া রাখিয়াছি কেন না নূতন করিয়া নিজের কল্যাণ চিন্তা করিবার শক্তি মাত্র তোমার নাই! নিষেধ-জর্জ্জরিত চির-কাপুরুষ নির্ম্মাণ করিবার এত বড় সর্ব্বদেশব্যাপী ভয়ঙ্কর লৌহ যন্ত্র ইতিহাসে আর কোথায়ও কি কেহ সৃষ্টি

করিয়াছে এবং মনুষ্যত্ব চূর্ণ করিবার যন্ত্রকে আর কোন দেশে ধর্ম্মের পবিত্র উপাধিতে আখ্যাত করা হইয়াছে ?"

রবীন্দ্র প্রৌঢ়াবস্থায় গাহিয়াছেন—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান,
অপমান হতে হবে তাহাদের সবার সমান ;
বিধাতার রুদ্র রোষে,
দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে,
ভাগ ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অন্ন পান,
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান,—"

সেই ;—

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে ;
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্র রোষে,
দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে,
ভাগ ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অন্ন পান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।

অথবা—

"তোমার আসন হ'তে যেথায় তাদের দিয়ে ঠেলে,
সেথায় শক্তিরে তব বিসর্জ্জন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হ'য়ে,
ধুলায় সে যায় ব'য়ে,
সেই নিম্নে নেমে এস নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ
অপমানে হ'তে হবে আজি তোরে সবার সমান।"

"যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে।
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে॥
অজ্ঞানের অন্ধকারে;
আড়ালে ঢাকিছ যারে;
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান॥"
"শতেক শতাব্দি ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি,
দেখিবারে পাও নাকি,
নেমেছে ধুলার তলে নীচ পতিতের ভগবান,
অপমানে হ'তে হবে সেথা তোরে সবার সমান।
দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে।
সবারে না যদি ডাক,
এখনো সরিয়া থাক,
চৌদিকে জড়ায়ে রেখে আপনার অভিমান—
মৃত্যু মাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান॥"
রবীন্দ্রনাথ যৌবনে গাহিয়াছিলেন—
"ওই যে দাঁড়ায়ে নত-শির,
মূক সবে,—ম্লান-মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার—
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার;—
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,

মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটী অন্ন খুঁটী, কোন মতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া, সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘ শ্বাসে
মরে সে নীরবে! এই সব মূঢ় মূক ম্লান মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্তি শুষ্ক ভগ্নবুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে!
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনই জাগিবে তুমি, তখনই সে পলাইবে ধেয়ে;
যখনই দাড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার,—তখন সে
পথ-কুক্কুরের মত সত্রাসে সঙ্কোচে যাবে মিশে;
দেবতা বিমুখ তারে কেহ নাহি সহায় তাহার
মুখে করে আস্ফালন জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে!
বড় দুঃখ বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার!
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস বিস্তৃত বক্ষ পট!

এ দেশের কোটি কোটি অস্পৃশ্যজনসাধারণ সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় বেদনাবিদ্ধ প্রাণে বলিয়াছেন—

যাহারা শত শত শতাব্দী ধরিয়া ঘোর দারিদ্র্য দুঃখ অপমান লাঞ্ছনা সহিয়াও ভারতের নিজস্ব সাধনা ও সভ্যতাকে জ্ঞানে কি—অজ্ঞানে সাগ্নিকের অগ্নির মত জ্বালাইয়া জাগাইয়া রাখিয়াছে, যাহাদের আমরা বিলাতি শিক্ষার মোহে আইন আদালতের প্রভাবে জমিদারের খাজনা ন্যায্য ভাবে কি অন্যায় করিয়া বাড়াইবার জন্ম শত প্রলোভন দেখাইয়া, শত অত্যাচার করিয়াও একবারে নষ্ট করিতে পারি নাই, যাহারা বাস্তবিকই একাধারে বাঙ্গালাদেশের রক্ত-মাংস-প্রাণ তাহারা বড় কি আমরা বড় ? কোন্ সাহসে কিসের অহঙ্কারে তাহাদের জল স্পর্শ করি না, কাছে আসিলে ঘৃণিত কুকুরের মত তাড়াইয়া দিই ? এত অহঙ্কার কিসের ? এত দাম্ভিকতা কেন ? আমরা যাহারা হিন্দু হিন্দু বলিয়া চীৎকার করি, আস্ফালন করি—সেই আমরা যে দিনে দিনে যাহা হিন্দু ধর্ম্মের ধর্ম্মস্থান সেখানে যাইয়া আঘাত করিতেছি। এমনি আমাদের মোহ, আমরা কি তাহা দেখিয়াও দেখিব না বুঝিয়াও বুঝিব না। বর্ণাভিমান লইয়া এমনই করিয়া মরণের পথে ভাসিয়া যাইব ? ঐ যে মা ডাকিতেছেন—সাবধান ! সাবধান ! ওঠ ! ওঠ ! জাগ ! মিথ্যা অভিমান বর্জ্জন কর ! ঐ যে বাঙ্গলার কৃষক সমস্ত দিন বাঙ্গলার মাঠে মাঠে আপনার ও আমার কাজ শেষ করিয়া নিশাবসানে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাঙ্গলার কুটীরে কুটীরে বাঙ্গলার গান গাইতে গাইতে ফিরিতেছে। উহারা মুসলমান হউক, চণ্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ ! অবিশ্বাসী তোমার শুষ্ক প্রাণে বিশ্বাস জাগাও ! তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ ! আততায়ী ! তোমার হাতের ছুরিকা ফেলিয়া দাও—জন্মের মত ফেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ ! ডাক ! ডাক ! সবাইকে ডাক ! প্রাণের ডাক শুনিলে, কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে ? ওঠ ! জাগো ! ডাক ! আপনার কল্যাণকে জাগাও ! বল, এস ভাই তুমি মুসলমান হও খৃষ্টীয়ান হও, শূদ্র হও, চণ্ডাল হও, তোমাকে আলিঙ্গন করি।"

আর ভারতের যে কোটী কোটী নর-নারায়ণকে নিম্নবর্ণ আখ্যা দিয়া আমরা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছি, তাহাদিগকে আবার মনুষ্যের মর্য্যাদা দিতে হইবে। ভারতের অপমানিত উপেক্ষিত গণ নারায়ণকে—যদি আমরা তাহাদের জন্মগত অধিকার দিতে সঙ্কুচিত হই, তবে স্বরাজ লাভের কথা বলিবে কোন্ সাহসে? মহাত্মা গান্ধি এই উপেক্ষিত নর-নারায়ণকে ভুলেন নাই, কারামুক্ত হইয়াই সর্ব্বাগ্রে তাহাদের কথাই মনে হইয়াছে। আনন্দবাজার ১।১১।৩০।

কিছুদিন পূর্ব্বে মিঃ এণ্ড্রুজ বিহার ছাত্র কন্‌ফারেন্সে সভাপতির কার্য্য করিবার নিমিত্ত ডানটন গঞ্জে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় বাঁকিপুরে সার্চ্চলাইট পত্রিকার এক প্রতিনিধির সহিত এইরূপে কথোপকথন হয়। * * *

প্রশ্ন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আপনার কি মত?

উত্তর। ভারতবর্ষ অবশ্য স্বাধীন হইবে। উহা ব্যতীত ভারতবর্ষের আত্মসম্মান রক্ষার উপায় নাই। আমি ইংরাজ, ইংরাজ জাতি স্বাধীনতাকে খুব সম্মান করে। অমি যথার্থ খৃষ্টানের মত এই সাধুর ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করি যে, আমি যেমন স্বাধীন ভারতীয়েরা তেমনই স্বাধীন হউক।

প্রশ্ন। ইংলণ্ড কি এখন ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতা স্বীকার করিবেন?

উত্তর। ইংলণ্ডকে উহা স্বীকার করিতে হইবে। নিখিল ভারত যদি সম্মিলিত হইয়া এই দাবী জানান যে, স্বাধীনতা ব্যতীত অন্য কিছুতে তাহাদের তুষ্টি নাই তাহা হইলেই উহা স্বীকার করিতেই হইবে। যদি অধিকাংশ লোকে স্বাধীনতা দাবী না করে তাহা হইলেই অবস্থা বিপজ্জনক হইবে।

প্রশ্ন। আপনি কোন্ শ্রেণীর লোকের কথা বলিতেছেন?

উত্তর। আমি ভারতবর্ষে ৫ কি ৭ কোটি অস্পৃশ্য অনুন্নতদের কথা

ভাবিতেছি। ক'ার ভারতীয়েরা এই সকল অস্পৃশ্যকে তাহাদের সমান বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। হিন্দু মুসলমান অনৈক্য সমস্যার সমাধান হইয়াছে। এক্ষণে এই অস্পৃশ্য জাতির সমস্যার যদি আজ সমাধান হয় তবে আগামী কল্যই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। জোহনবর্গে এক ইউরোপীয় আমাকে বলিয়াছিলেন—"মিঃ এণ্ড্রুজ, আমরা শ্বেতাঙ্গগণ ভারতীয়দিগকে "অস্পৃশ্য" বলিয়া মনে করি। উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয়েরা ভ্রাতার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন অন্যত্র সেইরূপ ব্যবহারই পাইয়া থাকেন।" সঞ্জীবনী ২৫।৭।২৭।

অধ্যাপক বেদান্তশাস্ত্রী ও অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় "যশোহর প্রাদেশিক সম্মিলন" হইতে আসিলে তাঁহার ব্রাহ্মণ-বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনগণ জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও অস্পৃশ্য জাতির সহিত জলাচরণ বিষয়ক জাতনাশা প্রস্তাব কিরূপে সমর্থন করিলেন। শ্রীযুত বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় উত্তরে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করেন—যাহা তিনি প্রকাশ্য কনফারেন্সেই বলিয়াছিলেন।—

১ম।—দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, সেই সকল কংগ্রেসকর্ম্মী তাঁহার মতে সন্ন্যাসীর শ্রেণীভুক্ত। সন্ন্যাসীদের যেমন জাত নাই, গোত্র নাই, পিতামাতার পরিচয় নাই,—অর্থাৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে যাঁহারা নিজের দেশ, সকল জাতিকে যাহারা নিজের জাত, সকল গোত্রকে যাঁহারা নিজের গোত্র, বিশ্বের পিতামাতা যাহাদের উপাস্য, যাঁহারা পরব্রহ্ম গোত্র,—তাঁহারাই সন্ন্যাসী। নারায়ণের "পাঞ্চজন্য" ধ্বনিতে জাগ্রত হইয়া যাঁহারা অনাসক্তভাবে বিশ্বের মুক্তি কামনাকে বুকে লইয়া কংগ্রেসের সেবা করিতেছেন—তাঁহারা সন্ন্যাসী বৈ আর কি? সুতরাং ইঁহাদের অস্পৃশ্যতারূপ ছোঁয়াচে রোগ থাকিতে পারে না—থাকা উচিত নয়।

২য়—মানুষের প্রাণে যখন খুব বড় রকমের একটা অনুরাগ আসে, বিশেষ একটি ধর্ম্ম ফুটিয়া উঠে, সেখানে ছোটখাট দু একটা খুচরা আচারধর্ম্ম চাপা পড়িলে আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না। স্বাধীনতারূপ মহান্ ভাবের বন্যায় সত্যই যাঁহাদের প্রাণ ভরপুর, তাঁহাদের কাছে সাধারণ গৃহস্থের ছোটখাট দু'একটা আচার উপেক্ষিত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। হিন্দুসমাজে এহেন প্রেমিকদের জন্য উচ্চ আসন থাকা উচিত—চিরকালই তাই ছিল।

৩য়—যে হিন্দু-সমাজে হাড়ের কয়লা দ্বারা পরিষ্কার করা বিলাতী চিনির মিষ্টান্ন এবং বিলাতী লবণে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা নারায়ণের ভোগ চলিতে পারে, যাঁহারা গরু, শূকর ও অন্যান্য অজ্ঞাত পশুর অস্থি পোড়ান কয়লার দ্বারা পরিষ্কৃত লবণ ও চিনি দিন রাত উদরস্থ করিতেছেন, বাজারের সিদ্ধ চাউল খাইয়া যাঁহারা কৌলীন্য রক্ষা করেন, শাস্ত্রানুসারে পবিত্র বিলাতী বস্ত্র যাঁহাদের অঙ্গের নিত্য ভূষণ—তাঁহাদের কাছে অশুচি বা অস্পৃশ্য কিছু আছে কি? যে কারণে কার্পাসসূতার তৈয়ারী যজ্ঞোপবীত ব্যবহার্য্য, শ্রাদ্ধ বিবাহাদি ধর্ম্মকার্য্যে পট্টবস্ত্র পরিধানের বিধান, তাহাত, হিন্দু সমাজ ভুলিয়াই রহিয়াছেন।

৪র্থ—ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে—জাতীয় উত্থানের জন্য এমন একদল লোকের দরকার, যাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড—এমন কি একমাত্র ধর্ম্ম হইবে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা বা ধর্ম্ম সংস্থাপন। স্ত্রীপুত্রের কান্নাকাটীতে যাঁহাদের চরণ টলিবে না পিতার তর্জ্জনে গর্জ্জনে ও মাতার ক্রন্দনরোলে যাঁহাদের হৃদয় গলিবে না, বিদ্যুতের ছটায়, বৈজ্ঞানিক যান বাহনে, তরবারির ঝনঝনায় ও গোলাগুলীর ঘড় ঘড় শব্দে যাঁহাদের প্রাণ দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিবে না, স্বাধীনতার সংগ্রামই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সেই সকল বিশ্বপ্রেমিক কর্ম্মিগণের ছুৎমার্গ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। হিন্দু সমাজ আনন্দে ইঁহাদের বরণ করিয়া লইবেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুত বেদান্ত শাস্ত্রী সাধারণ ভাবে যে একটী কথা বলেন, তাহা এই—একজন নমঃশূদ্র বা অন্য কোন অস্পৃশ্য জাতির লোক যতদিন হিন্দুধর্ম্ম মানিয়া চলে, ততদিনই হিন্দুগণ উহাদের অস্পৃশ্য মনে করেন, খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার অব্যবহিত পর হইতে স্পর্শ দোষের বন্ধন হিন্দুরাই শিথিল করিয়া দেন। এইরূপ ছুৎমার্গের কোন মৌলিকতা আছে বলিয়া তাঁহার ধারণা নাই।

"যাঁহারা যুগ যুগান্তর হইতে সেবার বিনিময়ে ঘৃণা অবজ্ঞা লাথি জুতা খাইয়া নীরবে আপন ব্রত সাধন করিয়া যাইতেছেন। * * * তাঁহারা অস্পৃশ্য হইল। স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদিগের মধ্যে আছেন, তাঁহাদিগকে ছুঁইয়া আছেন। মানুষ তাঁহাদিগকে না ছুঁইলে সেটা মানুষের অতি বড় আস্পর্দ্ধা ও ভ্রম। গায়কবাড় ঠিকই বলিয়াছেন, যে, Those who seek equity must do equity, যাহারা ন্যায্য ব্যবহার পাইতে চায় তাহাদিগকে ন্যায্য ব্যবহার করিতে হইবে। সুতরাং আমরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যেরূপ সমান অধিকার চাহিতেছি, সামাজিক ব্যবহারেও তেমনই সমান অধিকার দিতে হইবে। বোম্বাইএর সভায় শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি গোঁড়া হিন্দু যোগদান করিয়াছিলেন, তিনি বলেন—হিন্দু শাস্ত্র অস্পৃশ্যতার সমর্থক নহে। মন্বাদিতে ইহার অনুকূল ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।" (অস্পৃশ্যতা নিবারণের মন্ত্রণা সভা—প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৫—৭০ পৃষ্ঠা)

"স্মৃতি পুরাণাদি সামান্যবুদ্ধি মনুষ্যের রচনা, ভ্রম, প্রমাদ, ভেদবুদ্ধি ও দ্বেষ বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তাহার যেটুকু উদার ও প্রীতিপূর্ণ, তাহাই গ্রাহ্য, অপরাংশ ত্যাজ্য। উপনিষদ্ গীতা যথার্থ শাস্ত্র। রামানুজ শঙ্করাদি সঙ্কীর্ণ হৃদয় পণ্ডিতজ্ঞী মাত্র। সে প্রীতি নাই,—পরের দুঃখে তাঁহাদের প্রাণ কাঁদে নাই—শুষ্ক পণ্ডিতাই।

অপর এক মহা বিপ্রপত্তি—আমার দিন দিন দৃঢ় ধারণা এই যে জাতি-বুদ্ধিই মহা ভেদকারী ও মায়ার মূল—জন্মগত বা গুণগত সর্ব্বপ্রকার জাতিই বন্ধন। কোন কোন বন্ধু বলেন—তা মনে মনে থাক,—বাহিরে, ব্যবহারিকে জাতি আদি রাখিতে হইবে বৈ কি। মনে মনে অভেদ বুদ্ধি—আর বাহিরে পিশাচ নৃত্য—অত্যাচার উৎপীড়ন—গরীবের যম—আর চণ্ডালও যদি বড় মানুষ হয়, তিনি ধর্ম্মের রক্ষক ॥

* * * আর জাতি ইত্যাদি উন্মত্ততা যাজকদের লিখিত গ্রন্থেই পাওয়া যায়,—ঈশ্বর প্রণীত গ্রন্থে নাই। যাজকদের পূর্ব্ব পুরুষদের কীর্ত্তি তাঁহারাই ভোগ করুন, ঈশ্বরের বাণী আমি অনুসরণ করি—তাহাতেই আমার কল্যাণ হইবে।" (স্বামীবিবেকানন্দ প্রণীত পত্রাবলী ৩য় ভাগ)

স্বামী অভেদানন্দ বলেন—আমাদের ধর্ম্মে কোনরূপ জাতিভেদ থাকিবে না, জাতিভেদ সামাজিক প্রথা মাত্র, ধর্ম্মের সহিত উহার কোনই সংস্রব নাই। বেদও তাহাই শিক্ষা দিতেছেন। (উদ্বোধন ১।৫।১৩)

এইরূপ ভাবে শত শত শতাব্দীর ঘৃণা অবজ্ঞায় নিম্ন শ্রেণীস্থ ভ্রাতৃবর্গের ইংরাজী শিক্ষিত বর্ত্তমান যুগের আলোপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণের প্রাণে যে কিরূপ হিংসা ও ক্রোধের বাড়বানল সঞ্চিত হইতেছে তাহা কি অন্ধ জাত্যভিমানী তথাকথিত উচ্চ জাতিগণ বুঝিতেছেন না? একটু নমুনা মাত্র দেখাইতেছি। "এই যে ভারতের অজ্ঞাত মেরুদণ্ডস্থানীয়, তথা কথিত শূদ্র প্রমুখ "নিম্ন শ্রেণী" লক্ষ লক্ষ বৎসরের অত্যাচার, পদাঘাত, কষাঘাত, ঘৃণা, অবমাননা সহ্য করিতে করিতে পশুর মত হইয়াছে, তোমরা জন কয়েক উচ্চ শিক্ষিত লোক তাহাদের জন্য কি করিতেছ? আর তোমার পুরোহিত, তোমার জমিদার, তোমার উকীল, তোমার মোক্তার, তোমার দারোগা, তোমার দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক সংবাদ পত্র "ওগো একে ছুঁইও না জাতি যাবে, ইহার সহিত একত্র বসিও না মান যাবে, ইহাকে লেখাপড়া

শিখাইও না, ভদ্রলোকের ভাত মারা যাইবে। ইহারা শিক্ষা পাইলে জমী-দারীতে অত্যাচার উপদ্রব চলিবে না, মামলা মোকদ্দমা হ্রাস পাইবে, সুতরাং ইহাদিগকে নির্ব্বোধ রাখ,—ইত্যাদি ধুয়া ধরিয়া দেশকে প্রকৃত শ্মশানে পরিণত করিয়াছ ও করিতেছ। তোমরা কি স্বায়ত্ত শাসনের যোগ্য হইয়াছ? তোমরা স্বায়ত্ত শাসন পাইলে কি নিম্ন শ্রেণীর রক্ষা আছে? তোমাদের প্রতিবন্ধকতায় নিম্নশ্রেণী কি রাজকীয় কোনও উচ্চ অধিকার পাইতে পারে? হাজার হাজার বৎসরের নিপীড়িত জাতি আমরা, ইংরেজ আমলে ইংরেজী আইনের উদারতায় ক্রমশঃ আমাদের মানুষ্যত্বের বিকাশ হইতেছে। আমরা চিরদিন ইংরেজ রাজের অধীনে সুখে সম্মানে শান্তিতে রাজভক্ত প্রজারূপে বাস করিতে চাই। রাজ-ভক্তি আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক এবং উপকারী।”

“শোন হিতবাদী প্রমুখ বাঙ্গালার মসীজীবি বাবু সম্প্রদায়, জ্ঞান-গরিমা ঐশ্বর্য্য, বল, বিক্রম, সভ্যতা ও স্বাধীনতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজাতি ইংরাজের নিকট তোমরা শতবৎসরের পরাধীন দুর্ব্বল প্রজা হইয়া যে অভাবনীয় সদ্ব্যবহার আশা কর, তোমাদের প্রতিবেশী, তোমাদের অন্নদাতা বস্ত্রদাতা দৈনিক-শারীরিক-পরিশ্রমদাতা, সাহা, মাহিষ্য নমঃশূদ্র সূত্রধর, স্বর্ণকার কুম্ভ-কার, মালাকার, তেলি, তিলি, ধোপা, পোদ, গজেন্দ্র-দাস, নাথ, ব্রাত্যক্ষত্রিয় ভূমিমালী, প্রভৃতি কৃষক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপর (তোমরা যাহাদিগকে নিম্নশ্রেণী বল, এখন কতকটা সাধুভাষায় “অনুন্নত সম্প্রদায়” বল) তেমন সরল সদয় ব্যবহার করিতে কোন দিনও শিখিয়াছ কি?

বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘোর প্রতিযোগিতা হেতু বাঙ্গালার জীবন-মরণের দিনে যাহারা জাতি-কুল-মান রাখিয়াছে, রাখিতেছে, যাহাদের সংখ্যা হিসাবে তোমরা বাঙ্গালায় একেবারে মুষ্টিমেয়, রাজনৈতিক চালের গলাবাজিতে এই সকল নিরীহ, নিরক্ষর সবল, ধর্ম্মভীরু সম্প্রদায় সমূহকে অন্ধকারে রাখিয়া,

গোটা বাঙ্গালা দেশের উপর ইংরেজ রাজপুরুষ, ইংরেজ আম্‌লা-তন্ত্র ও ইংরেজ ব্যবসায়ী দলকে চটাইয়া দিতেছ।

ছিল একদিন—যে দিন তোমরা ওকালতী মোক্তারী করিয়া ধন কুবের হইতে; ছিল একদিন—যেদিন তোমরা কেরাণী-গিরি ও ডাক্তারী করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করিতে; দেশের জনসাধারণের অজ্ঞতা ও শক্তিহীনতার উপর তোমাদের স্বার্থ-সর্ব্বস্ব-বিলাস-জীবন সদর্পে সমুন্নত ছিল। জাতিভেদের প্রাথমিক সময় হইতে এই পর্য্যন্ত তোমরা স্বজাতির প্রতি স্বজাতির হিংসা বিদ্বেষ ও অনুচিত অত্যাচার মূলক আধিপত্যকেই হিন্দু-ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছ এবং স্বার্থানুরোধে নিরাশ্রয় জনসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছ, তোমরা কর্ম্মদোষে অভাবে পড়িয়া ইংরেজের বিদ্বেষ-পরায়ণ, আবার এদিকে সরল ব্যবসায়ী শ্রেণীকে (তোমাদের ভাষায় নিম্নশ্রেণী) রাষ্ট্র-ব্যাপারে তোমাদের দলে টানিতে মজবুত। হাজার হাজার বৎসর হইল, আর্য্য-হিন্দু-ধর্ম্মের ও হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের প্রাণ যাহা, তাহা পদ-দলিত করিয়াছ।

নিজেদের কল্যাণ নিজেরা করিতে পার না,—তোমাদের প্রাণের ভিতরই প্রাণ নাই,—অনুন্নত সম্প্রদায় কি তোমাদের সঙ্গে এখন যোগ দিবে? কিছুতেই দিবে না। তোমাদের গুণ, কর্ম্ম, স্বভাব, মানব সেবার উপযোগী হইলে অনুন্নত সম্প্রদায়তো তুচ্ছ কথা, পৃথিবী শুদ্ধ তোমাদের কাছে আসিবে।

কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স করিয়া তোমাদের দেশের শাসনভার হাতে চাও, আর জনসাধারণকে ভেড়ার মত যে পথে খুসী সেই পথে নিতে চাও, তোমরা শাসনে অধিকার পাইলে বিদ্যা শিক্ষার অপরাধে ব্রাহ্মণেতর জাতির জন্ম পুনঃ "জিহ্বাচ্ছেদ," "কর্ণবেধ" প্রভৃতি দয়াল দণ্ডের ব্যবস্থা হবে নাকি? দেশ দেশ করিয়া মর, দেশের মানুষ-গুলাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছ কি? আগে নিজের আত্মার মধ্যে স্বায়ত্ত শাসন লাভ কর, পরে বাহিরে স্বায়ত্ত শাসনের সন্ধান পাইবে।

তোমরা ভারত গবর্ণমেণ্টের আম্‌লা-তন্ত্রের বিরোধী, তোমাদের হিন্দু জমিদার, তালুকদার ও তাহাদের নায়েব গোমস্তাগণ কালান্তক যম সদৃশ সুদূর মফঃস্বলে নিরক্ষর হিন্দু মুসলমান প্রজার উপর কর আদায়ে, বৃদ্ধিতে ও উৎকোচ গ্রহণে কিরূপ পাশবিক অত্যাচার করে, একদিনও তাহার খবর রাখিয়াছ কি? সেদিকে তোমাদের প্রবৃত্তি আছে কি?

নিরাশ্রয়, নিরক্ষর জনসাধারণের প্রতি আগে নিজেদের দোষ সংশোধন কর, নিজেদের মনুষ্যত্বের প্রতিদানে আগে তাহাদিগকে মানুষ কর। মফঃস্বলে অত্যাচারী জমিদার ও দুষ্ট মহাজনদিগের কবল হইতে তাহাদের ধন, মান, প্রাণ সম্পত্তি রক্ষা কর, অবৈতনিক পাঠাশালার বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের ছেলেদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দাও। উচ্চ শ্রেণীর ছেলেগণ উচ্চ শিক্ষা পাইয়াও যাহাতে চাকুরীর জন্য ব্যস্ত না হন, শারীরিক পরিশ্রমকে আদর করেন, আগে তাহাই কর। (সমাজ বন্ধু অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩২৪)

জল চল ও খাদ্যাখাদ্য বিচারের আলোচনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক পুর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইল। অহিন্দু হস্তে জল খাওয়ার দরুণ ভারতে কি কাণ্ডই না হইয়াছে। মানুষ যে এত হীন এত নির্ম্মম হইতে পারে মানুষ যে মানুষকে এত ঘৃণা এত অবজ্ঞা এত ছোট এত নীচ অধম ভাবিতে পারে, এ পৃথিবীতে অন্য কেহ ভারতবর্ষ ব্যতীত এ কল্পনা আনিতেই পারে নাই। এক সময়ে ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে, ভারতের পর পদানত হইবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে রাজা রাজ্য পালকে মুসলমানগণ যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ধন রত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া এবং তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া তাঁহাকে মুসলমানগণ বলপূর্ব্বক মুসলমান দ্বারা আনীত জলাদি পান করিতে বাধ্য করিয়াছিল সুতরাং সেই দিন হইতে তাঁহার জাতি গিয়াছিল। কিন্তু আমার মনে হয় যেদিন রাজ্যপাল যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানগণের দ্বারা বাহুবলে পরাজিত হন, সেই দিন হইতে ভারতের পরাধীনতার সূত্রপাত হয় নাই পরন্তু যেদিন রাজা রাজ্যপাল, বহু চেষ্টার

রাজার অতুল ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও যখন হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রবেশ লাভ করিতে পারিলেন না এবং যখন তুষানলে জীবন আহুতি দিলেন সেই দিনই আমার যথার্থ মনে হয় ভারতের পরাধীনতার প্রথম আরম্ভ। যে দিন হলদিঘাটের যুদ্ধের পর রাণাপ্রতাপের কনিষ্ঠ সহোদর শক্তসিংহ যখন রাণাপ্রতাপের চরণ ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু যবনের অন্নগ্রহণ জন্য তাঁহাকে ভাই বলিয়া বক্ষে ধারণ করিবার পরিবর্ত্তে উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছিলেন—সেই দিনই মনে হয় ভারতের অধীনতা ভগবানের ন্যায়বিচারে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইল। শক্তসিংহের মত বীর—যিনি প্রতাপের তুল্য বীর ছিলেন এই দুই বীর যদি একত্রে দণ্ডায়মান হইতেন তবে ভারতের ইতিহাস কি পরাধীনতার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে পারিত ? ঐতিহাসিক ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহার বিচার করুন। যেদিন ভারতের বীর শ্রেষ্ঠ মহব্বৎ খাঁর পত্নী স্বামীর মুসলমান্ সংস্রবে যাওয়ার পরও যখন স্বামীর প্রতি অনুরাগ থাকা নিবন্ধন গৃহ হইতে, হিন্দুসমাজ হইতে, নির্ব্বাসিত হইয়া, গৃহ হইতে একাকিনী হিন্দু মহিলার স্বামী সকাশে গমনের করুণ কাহিনী যখন শুনিলাম তখনি বুঝিলাম ভগবান আমাদিগকে পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ন্যায় বিচারই করিয়াছেন। আজকালকার ঝুটা স্বদেশ প্রেমিকগণ বিশেষতঃ বাঙ্গালি স্বদেশ প্রেমিকগণ যেরূপে জাতিভেদের সমর্থন করিতেছেন ও পরস্পর জাতি বিদ্বেষের অনল জ্বালিতেছেন তাহাতে মনে হয় ভারত মাতা সত্বরই—গৌরবের আসন লাভ করিবেন। কি দুর্দ্দিনই না উপস্থিত ভারতে হইয়াছে। (শ্রীবিনয়চন্দ্র সেন সিরাজগঞ্জ।)

মরণপথ যাত্রী ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতিকে কি না দুর্ব্বুদ্ধিই ধরিয়াছে—কি না বুদ্ধি ভ্রংশই তাহার ঘটিয়াছে। সমাজে যে যত উপকারী, যে যত দরকারী, যাহাদের একদিনের সেবা ব্যতীত সমাজ একদিনও চলিতে পারে না—তাহার প্রতি তাহার ততোধিক অবিচার—ততোধিক অত্যাচার, ততোধিক ঘৃণা-

বমাননা—তত লাঞ্ছনা গঞ্জনা। 'যারে দিয়া চক্ষুদান তারেই করি অপমান।' এ দেশ এ জাতি ডুবিবে না? সকলেরই ভাত কাপড় চাই, বাড়ী ঘর পরিষ্কার করা ও রাখা চাই, এখানে সেখানে—জলপথে স্থলপথে নানা স্থানে গমনাগমন যাতায়ত করা চাই। তার জন্য কতকগুলি সেবাপরায়ণ জাতি আত্মদান করিয়াছে; আর তার পুরস্কার! পুরস্কার যুগযুগান্তরের লাথি ঝাঁটা পদ প্রহার নির্য্যাতন—অপমান লাঞ্ছনা প্রদান। যোগী সমাজ কাপড় বয়ন করিয়া বস্ত্রাভাব দূর করিত, ধোবা কাপড় কাচিত, নমঃশূদ্র—চাষি কৈবর্ত্ত পোদ কৃষিকার্য্য দ্বারা অন্ন যোগাইত—মালী বাড়ী ঘর পরিষ্কার করিত ধীবর মাছ খাওয়াইত,—নৌকা বাহিত, পাটনী পারাপার করিত, হাঁড়ি পূজা পার্ব্বণে বিবাহে অন্নপ্রাশনে ঢোল ডাক বাজাইত, ময়লা আবর্জ্জনাদি সাফ্ করিত। চুনারি পান খাইবার চুন যোগাইত—তেলী বা তৈলী তৈল যোগাইত—মুচি জুতা যোগাইত, বেহারা ডুলি পাল্কী বহিত ম্যাথর ময়লা পায়খানা পরিষ্কার করিত—ডোম শ্মশানের শেষ দিনে সেবা করিত। আর তার পুরস্কার। সে কথা লিখিয়া জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করিবার নয়। ভদ্রলোকগণকে ও বরং ২।৪।১০ দিন ২।৪ বৎসর না হইলে চলে কিন্তু ইহাদিগকে একদিন না হইলেও সমাজের চলে না—অথচ তার পুরস্কারের পরিবর্ত্তে দেওয়া হয় কি না, ঘৃণা অবজ্ঞা অপমান অবহেলা। বিদেশী বিধর্ম্মী ও বিজাতির লাথি ও বুটের আঘাত অল্প অপরাধে বিধাতা ব্যবস্থা করেন নাই, তবুও কি, আমাদের লজ্জা হইয়াছে? চৈতন্য আসিয়াছে? হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নয় কোটি কোটি যে চলিয়া গেল—অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিল—তবুও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? হায় আত্মঘাতি হিন্দু-জাতি! ম্লেচ্ছ বলিয়া যাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া নাক শিট্কাও কখন ভাবিয়া দেখিয়াছ কি—তারা কেন প্রভু আর তোমরা কেন তাদের দাস। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। এরূপ দৃষ্টান্ত শত শত আছে। বেশী দেখাইবার ইচ্ছা নাই।

জাতিভেদের অত্যাচার ঃ—সম্প্রতি 'পাইওনিয়ার' পত্রিকার জনৈক সংবাদদাতা এদেশের জাতিভেদ প্রথার ভীষণতা সম্বন্ধে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন এলাহাবাদ ষ্টেশনে একদল মেথর ট্রেণের টিকেট করিয়া ট্রেণের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া কোথায়ও গাড়ীতে উঠিবার সুবিধা পাইল না। মেথর বলিয়া যাত্রীগণ তাহাদিগকে কোন গাড়ীতে উঠিতে দিল না, সকলেই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে লাগিল। সংবাদদাতা স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছেন। তাহারা পরিশেষে একদল ইউরোপীয় যাত্রীর শরণাপন্ন হয়। তাঁহারা মেথরদিগকে নিজেদের চাকরের কামরায় তুলিয়া লইলেন। দলে দলে লোক মুসলমান খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে বলিয়া হিন্দুগণ আক্ষেপ করিয়া থাকেন। অথচ যে অকথ্য অত্যাচারের ফলে নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুগণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছে, সে দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই। (সঞ্জীবনী)

তোমরা ত মেথরদের ঘৃণা কর—তোদের মহা অপরাধ তারা তোমাদের গু মূত সাফ করে। যা, মা, ভগিনী, পিসীমা, মাসিমা,—ঠাকুরমা, আজি-মা স্ত্রী কন্যা প্রেমের বশে মায়ার বশে করে—, অথবা তাঁহারাও যাহা করেন না— (কেন না পুত্র কন্যা নাতি নাতিনী ছোট থাকিতেই করেন বড় হইলে আর করেন না) মেথর তাহাই করে—সামান্য মুদ্রার বিনিময়ে। ভাব দেখি, তোমরা শিক্ষিত ভদ্রজাতি না—অকৃতজ্ঞ কৃতঘ্নজাতি ? তোমরা ভাবিয়াছ কি ভগবানও মুচি মেথর বেহারা বাগদিকে ঘৃণা করেন ? ভুল—, তোমাদের বড় ভুল। ভগবান তাহাদিগকে কি চক্ষে দেখেন—শুনিবে ? তবে শোন কবির 'শেষ অভিষেক'—

"ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে ঐ যে
আসেন বিজয়ী কল্কি।
যত বেটা আছে মেথর চামার
কচু কাটাগোছ হবে তা সাবাড়—

ব্রাহ্মণদের নাচে ভুঁড়ি ভার,
বিলম্বে আর ফল্ কি ?
ললাট তাঁদের সজ্জিত হল
ঘন-চন্দন-পঙ্কে !
দিনে চোখ্ বুজে জাগিয়া ঘুমায়
চণ্ডাল-মুখ পাছে দেখা যায়—
শেষে যদি কিছু বাদ পড়ে হায়
দীর্ঘ পুণ্য-অঙ্কে !
অতি সাবধানে ঢাকা দিয়ে তাঁরা
বাঁচান পরম সত্ব !
যত টীকিটার বাড়ে গো দৈর্ঘ্য
যত বেড়ে ওঠে ফোঁটার বর্গ,
তত কাছাকাছি গো-লোক স্বর্গ
এমনি সূক্ষ্ম তত্ব !
আসেন কল্কি দৃপ্ত বিজয়ী
তরবারি হাতে ঝলিছে
প্রসন্ন মুখে করুণ হাসিটী
বেদনায় যেন বাজায় বাঁশিটী—
যুগান্তরের অত্যাচারের
বহ্নি নয়নে জ্বলিছে !
ব্রাহ্মণ সব চীৎকারি ওঠে
"জয় কল্কির জয় হে !
তরবারি হাতে চমকে ভীষণ
অশ্বের খুরে বাজে ঝন্ ঝন্,

বিদ্যুৎ ভরা উজ্জল নয়ন
আহত চাহিয়া রয় যে!
ব্রাহ্মণ যত প্রমাদ গণিয়া
পঠিতেছিলেন মন্ত্র।
কল্কি কিছুই নাহি বোঝে মানে,
ব্রাহ্মণদের ধরি দুই কাণে,—
বলে আজ যাও বাজার যেখানে
থামাও মৎস-তন্ত্র।
কাল হবে জেন বিচার আমার
মাপিব পাপ ও পুণ্য।
আসিতে ভুলোনা টীকিধারিগণ
আজ যাও সবে নিজের ভবন:
কি করিবে আর যত ব্রাহ্মণ
চলিল ফিরিয়া ক্ষুণ্ণ।
বিচার-সভায় বসেন কল্কি
শান্ত গভীর ছন্দ!
ডান দিকে বোসে সব দেবতাই
বামেতে বুদ্ধ নিমাই নিতাই
খৃষ্ট কৃষ্ট—আরো দেখা যায়
গান্ধী বিবেকানন্দ।
বলেন কল্কি—ব্রাহ্মণদের
বিচার হউক অগ্রে
হর্ষে তাদের বিপুল ভূঁড়িতে
পুলক নাচিল কি সুড়সুড়িতে!

ভাব আধিক্যে মুক্ত কচ্ছ—
চালান যাইবে স্বর্গে !
কল্কি বলেন—"ইহাদের পাপ
ছেয়েছে ভারতবর্ষ।
ত্রিভুবনে যত পাপ, তুলনায়
ইহাদের পাপ ভারী ভুল নাই,—
মহাকাশ ছেয়ে করেচে সে পাপ
বিধির চরণ-স্পর্শ !
স্বার্থের তরে ধর্ম্মের ভানে
শাস্ত্রের ছলনায় গো—
এরা পাষণ্ড এরা বর্ব্বর
ভণ্ড দস্যু এরা তস্কর,
যুগ যুগ ধরি কোটী কোটী নরে
রেখেছে পশুর প্রায় গো !
টীকির জোরেতে আছে এরা টিকে
সূত্র গলায় বাঁধিয়ে,
নাহিক সত্য, নাহিক শিক্ষা
কূপের মন্ত্রে এদের দীক্ষা,
এরা অমানুষ, এরাই ম্লেচ্ছ,
অন্ধকারের আঁধি হে !
এরা তমোগুণী, অহঙ্কারের
করে চির ক্রীতদাস্য !
এরা মানবের সনাতন অরি
হুকুম দিলাম—ইহাদের ধরি

পাঠাও নরকে, কহিলা কল্কি
গম্ভীর প্রীতি-আস্ত।
তারপর তিনি মেথরের দিকে
চাহি কহিলেন হেসে যে—
"এস সুন্দর, এস পবিত্র,
এস চিরশুচি, উদার চিত্ত!
এস গো মহান্ গুরু গরীয়ান্
এস অকুণ্ঠ বেশে হে!
সেবা যে ধর্ম্ম, কারে বলে ত্যাগ
দেখায়েছ তুমি কার্য্য!
মানবের সেবা করেছ নিত্য
কুণ্ঠাবিহীন অমল চিত্ত,
জননীর স্নেহে ভায়ের মতন—
তুমিই শ্রেষ্ঠ আর্য্য!
তুমি যদি ওগো দিনেকের তরে
করিতে গো সেবাবন্ধ।
সোণার জগত হইত নরক
কত মহামারি কত না মড়ক
জগৎ করিত শ্মশান সড়ক
প্রাণহরা দুর্গন্ধ!
তুমি যে মহৎ মানব সেবক,
তুমি হিমালয় তুল্য!
কোন সাধু চেয়ে নও তুমি কম
সেবার ত্যাগের করেছ চরম—

তবু হায় হায় জগতে তোমার
কেহ বোঝে নাই মূল্য !
না বুঝুক তারা হওনি যেমন,
হয়োনা তেমনি ক্ষুণ্ণ !
ছোঁয়নি তোমারে তাহারা তোমায়
ছিল না যোগ্য তব মহিমার
করিতে স্পর্শ—তুমি যে অপার
পারাবার সম-পুণ্য !
মানব সেবক খৃষ্ট গান্ধী,
বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য !
তুমি নও কম ইঁহাদের চেয়ে
জ্যোতির সাগরে আসিয়াছ নেয়ে—
মানব সেবক মহাত্মা তুমি
এঁদের মতনই ধন্য !
আজ হতে তুমি ইঁহাদের দলে
গণ্য হইবে অগ্রে,
আজ হতে তব, ওগো মহাপ্রাণ
উঁহাদের সাথে একাসনে স্থান
যাও চড়ি ওগো পুষ্পবিমান
নর-দেবতার স্বর্গে !
বিস্ময়ে মুখে কথা নাই সরে
আনন্দে ঝরে আঁখি, আ—
আজি মেথরের মহা অভিষেক
অরুণ পরায় কিরণের লেখ,—

বৃদ্ধ নিমাই বাঁধে বাহু ডোরে
লয়ে যায় সাথে ডাকিয়া !”

শিবরাম চক্রবর্ত্তী (আত্মশক্তি

তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীরা “অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ” জাতিদের উপর কিরূপ অত্যাচার করে, তাহার বিষময় ফল স্বরূপ হিন্দু-সমাজ দিন দিন কিরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে সে সম্বন্ধে ভ্যাক্‌সিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডবলিউ, সেন গুপ্ত অমৃতবাজার পত্রিকার একখানা পত্র লিখিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম উদ্ধৃত করিলাম :—

দোসাদ শ্রেণীর এক ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার দুইটী শিশুপুত্র ও বিধবা নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হয়। ইহার কিছুদিন পরে শিশু দুইটীর মাতাও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন তাহাদের প্রতিবেশী একটী উচ্চ শ্রেণীর জনৈক হিন্দুবৃদ্ধ তাহাদিগকে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দেয়। ইহার কিছুদিন পরে উক্ত বৃদ্ধও প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু তখন এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। দুইটী অস্পৃশ্য জাতির অনাথ শিশুকে আশ্রয় দেওয়ার দরুণ, তাহার জাত গিয়াছে সেই জন্য কেহই তাহার শব দাহ করিতে রাজী হইল না। তখন উক্ত সেনগুপ্ত স্বয়ং নিজের পয়সা খরচ করিয়া তাহার সৎকারের ব্যবস্থা করান, কোন প্রকারে তাহার শ্রাদ্ধাদিও সম্পন্ন করান, এবং উক্ত অসহায় বালক দুইটীকে নিজের আশ্রয়ে লইয়া আসেন। ইহার কিছুদিন পরে হঠাৎ বালক দুইটী নিরুদ্দেশ হয়, এবং কয়েক দিন পরে তাহারা মুসলমান বেশে ফিরিয়া আসে। তাহারা তখন বলে যে, তাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এখন তাহারা আর অস্পৃশ্য বা অন্ত্যজ নয়। হিন্দু ব্যারিষ্টার ও ভদ্র শ্রেণীর লোকে আদর করিয়া তাহাদিগকে

কাজে রাখিবে আর কোন নবাবও তাহাদের অন্ত্যেষ্টীতে যোগদান করিলে তাঁহার জাতি যাওয়ার আশঙ্কা নাই। (আনন্দ বাজার পত্রিকা)

টিয়াদের হিন্দুধর্ম্মত্যাগ।

মাদ্রাজের পশ্চিম উপকুলে ২॥ লক্ষ টিয়া বাস করে। ব্রাহ্মণের নিকট ইহাদের দেহ অস্পৃশ্য, ছায়া অস্পৃশ্য, এমন কি বাতাস পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য। ইহারা যদি কোন ব্রাহ্মণের নিকট কোন কথা বলিতে চায় তবে ২০০ হাত দূর হইতে কথা বলিতে হয়। টিয়ারা এখন লেখা পড়া শিখিতেছে—লেখাপড়ার ফল স্বাধীনতা ও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান। টিয়া ব্রাহ্মণের পাড়ায় যাইতে পারে না; ব্রাহ্মণ যে রাস্তা দিয়া যান, সে রাস্তায় চলিতে পারেনা; ব্রাহ্মণ যে পুষ্করিণীর জল খান, টিয়া সে পুষ্করিণীর তীরে যাইতে পারে না; শিক্ষিত টিয়া ইহা মানিবে কেন? টিয়ারা রাজপথে স্বাধীন ভাবে বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতেছেন। যতদিন লেখাপড়া জানিতনা, ততদিন তাহারা ব্রাহ্মণকে দেবতা মনে করিয়া সবই সহ্য করিয়াছে। কিন্তু এখন আর তাহারা অপমান সহিতে পারে না। তাই ২॥লক্ষ টিয়া হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে বহু সহস্র টিয়া খৃষ্টান ও মুসলমান হইয়াছে সম্প্রতি তাহাদের যে কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই নির্দ্ধারণ হইয়াছে যে শীঘ্র এক বৃহৎ সভা করিয়া তাহারা বৌদ্ধ হইবার জন্য চেষ্টা করিবে। টিয়াদের এই সঙ্কল্পের কথা শুনিয়াও মালাবারের নম্বোদ্রি ব্রাহ্মণের চৈতন্য হয় নাই।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে মালাবারে ১৬ লক্ষ হিন্দু ৬ লক্ষ মুসলমান, ৩২ হাজার খ্রীষ্টানের বাস ছিল। এখন মুসলমান সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। হিন্দুর সংখ্যা দেড়গুণও হয় নাই। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ ৪২ হাজার, ক্ষত্রিয় ৫০০, বৈশ্য ২৭০০০, নায়র ৩ লক্ষ ও টিয়া ৫॥ লক্ষ ছিল। তখন মালাবারে

যত লোকের বাস তন্মধ্যে হিন্দু শতকরা ৭২ ছিল। ৫০ বৎসর পরে হিন্দু সংখ্যা শতকরা ৫০ হইয়াছে। টিয়ারা যদি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে, তবে হিন্দুর সংখ্যা আরও হ্রাস হইবে। মোপলাদরে উৎপাতে হিন্দুদের মালাবারে বাস করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। টিয়ারা যদি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে, তবে হিন্দু আরও দুর্ব্বল হইবে। তবু হিন্দুর চৈতন্য হইতেছে না। হিন্দু যদি মান সম্মান লইয়া বাঁচিতে চায় তবে অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া সকলকে সমভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। (সঞ্জীবনী ২২শে চৈত্র ১৩১৩)

আরও শুনিতে চাও কি? কেন বৎসর বৎসর হিন্দু কমে আর মুসলমান খৃষ্টান বাড়ে। পুনরায় সঞ্জীবনী পত্রিকা লিখিয়াছেন—

হিন্দুর আশঙ্কা।—বিগত দশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতের ৪০ হাজার হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার হিন্দু খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। হিন্দু যতদিন আপনার স্বধর্ম্মী ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদান করিতে শিক্ষা না করিবেন, ততদিন লক্ষ লক্ষ হিন্দু এইরূপ স্বধর্ম্ম বর্জ্জন করিবে। (সঞ্জীবনী ফাল্গুন ১৩২০)

এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমাদের কি ধ্বংস হওয়া না বাঁচিবার চেষ্টা করা। কেবল কি প্রধান ২ পণ্ডিতগণের পাঁতির আশায় বসিয়া থাকিলেই চলিবে,—না, আমাদের নিজেদের স্কন্ধে এই গুরুভার লইতে হইবে। আমরা বলি আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা করিবার সময় নাই। এ ভার আমাদেরই নিজেদের হাতে লইতে হইতেছে।

"সমাজ-বিধান চিরদিনই ব্রাহ্মণ দিয়াছেন। তখন বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ছিল, সে দিনও মনীষী রঘুনন্দনের ব্যবস্থার সম্মুখে সমস্ত বাঙ্গালী হিন্দু মাথা নত করিয়াছিল। সেদিনকার বাঙ্গালাও স্বাধীন ছিল না—মুসলমানের অধীন ছিল। মুসলমান-যুগেও ব্রাহ্মণ ছিল,—ব্রাহ্মণের মেধা ছিল, হৃদয় ছিল। তাঁহারা সমাজকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারিতেন। কিন্তু ব্রিটিশ যুগে সে ব্রাহ্মণ

ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিলাসের পঙ্কে আকণ্ঠ-নিমজ্জমান ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য-গরিমার স্পর্দ্ধা হাস্যোদ্রেক করে মাত্র। ধনীর চাটুকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পুত্রকে ইংরেজী স্কুলে পাঠাইয়া যখন ব্রাহ্মণত্বের দাবী করেন,—তাহাও যদি উপেক্ষার হয়, তবু দারোগা-ব্রাহ্মণ, উকীল-ব্রাহ্মণ, কেরাণী-ব্রাহ্মণের এমন কি পাচক-ব্রাহ্মণের—জাত্যভিমান একেবারেই অসহনীয়।

এই সমস্ত আচার ভ্রষ্ট, স্ববৃত্তি ত্যাগী, বিপথগামী-ব্রাহ্মণ-সন্তানগণের মধ্যে মহাপ্রভুর হৃদয় নাই, রঘুনন্দনের মেধা নাই। সে দিনের ব্রাহ্মণের ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম নাই। ইহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কোন ফল নাই। জাতি হিসাবে, সমাজের কর্ত্তা হিসাবে—ইহারা একা কোন বিধান দিতে পারিবেন না। আবার দোষ কেবল একা ব্রাহ্মণেরই নয়। ব্রাহ্মণ-সভার মতে যাহারা শূদ্র. তাঁহারাও অপর শূদ্রকে অস্পৃশ্য বলেন। কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি, ব্রাহ্মণ-সভার আপত্তি সত্ত্বেও, নির্দ্দিষ্ট শূদ্রবর্ণে থাকিতে রাজী নহেন, অথচ যদি অন্য কোন জাতিও তাঁহাদেরই মত শূদ্রবর্ণে থাকিবার আপত্তি প্রকাশ করেন, তবে তাঁহারা সেই অভিপ্রায়কে কিরূপ চক্ষে দেখেন, এবং ঐ জাতি সকলের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন ?

যাহা হউক বর্ণাশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে। তবে একথা বলা যায় যে, বাঙ্গালার অবজ্ঞাত জনসাধারণ অস্পৃশ্য ও জল-অচল থাকিতে ক্রমে ক্রমে অধিকতর অনিচ্ছাপ্রকাশ করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধির আশ্বাস বাক্যে, তাঁহারা আশান্বিত হইয়া উঠিতেছেন, কোন প্রকার স্তোকবাক্যে প্রতারিত হইতে আর তাঁহারা রাজী নহেন। স্বরাজ যদি আমরা একান্ত ঐকান্তিক ভাবেই কামনা করি, তাহা হইলে এই সমস্যার মীমাংসা করিতেছি না কেন ?

মীমাংসা খুব কঠিন নয়। সহরে আসিয়া তো আমরা বেশ উদার হইয়া পড়ি, রেলগাড়ীতে, ষ্টীমারে বেশ উদারতা ; তবে গ্রামে ফিরিয়া গেলেই ভণ্ড

সাজি কেন? ছুঁৎমার্গের ব্যাধির এক প্রধান উপসর্গ—ব্যবহার, স্থান, কাল ও পাত্রভেদে ভণ্ডামী।

জনসাধারণের অনুমোদন ও সমর্থনেই বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলন এত প্রবল ও প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর গণবিগ্রহ নিদ্রিত নহেন। অপেক্ষা?—বহুদিন করা হইয়াছে; সহ্যতা—সীমা অতিক্রম করিয়াছে!

ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন বিশেষ জাতির চেষ্টায় এই ব্যাধি দূর হইবে না। শিক্ষিত-অশিক্ষিত একত্র মিলিত হইয়া এই চেষ্টা করিতে হইবে। কংগ্রেসকেই সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইয়া কার্য্যে হাত দিতে হইবে। জনসাধারণ ও শিক্ষিত দেশবাসীর নিকট, সমাজ সংস্কার ও হিন্দুমহাসভার নিকট, আমরা বিনীতভাবে এই নিবেদন জ্ঞাপন করিতেছি।" (আনন্দ বাজার পত্রিকা)

তার পর জল চলের কথা। এ সম্বন্ধে 'হিতবাদী' লিখিয়াছিলেন :—

জলচল।

"আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন—"তোমরা কি ছত্রিশ জাতিকে জলচল করিয়া লইতে চাও?" উত্তরে আমরা বলিলাম—"হাঁ, আমাদের সেই বাসনা। আপনারা এখন যাহা চালাইয়াছেন, তাহাতে ছত্রিশ কেন, ছাপ্পান্ন জাতি জল চল হইয়া গিয়াছে। আমরা কেবল সেইটুকু আপনাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে চাহি।" তিনি আমাদের উত্তর শুনিয়া নীরব রহিলেন। আজ আমরা সেই কথাটা পাঠকবর্গকে খুলিয়া বলিব।

"পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালায় হিন্দু সমাজ খাঁটি হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে চলিত, তখন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সমাজের উচ্চ জাতীয়গণ অজ্ঞাত-কুলশীল কোন ব্যক্তির স্পৃষ্ট জল ব্যবহার করিতেন না; অজ্ঞাত-কুলশীল কাহাকেও চাকর খানসামার পদে নিযুক্ত করিতেন না। তখন বাড়ী বাড়ী পাচক

ব্রাহ্মণ থাকিত না; যাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া গৃহে পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতে হইত, তাঁহারা সে ব্রাহ্মণের চৌদ্দপুরুষের সমাচার লইয়া তবে তাহাকে পাকশালায় প্রবেশ করিতে দিতেন। ব্রাহ্মণ মাত্রেই রন্ধন করিতে জানিতেন এবং বিদেশে যাইলে স্বপাকেই ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতেন। যতদিন সমাজে এই কড়াকড়ি ছিল, ততদিন জল চল ও জল-অচলের কথা লোকে কহিত এবং সে কথার একটা মূল্যও ছিল।

এখন সমাজের ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল জাতিই এখন বাঙ্গালীর ঘরে চাকরী করিতেছে। উড়ে, হিন্দুস্থানী, গুর্খা, শিখ, পাহাড়ি, বুনো প্রভৃতি অজ্ঞাত-কুল-শীল ভারতবাসী অন্নাভাবে বাঙ্গালীর দ্বারস্থ হইলেই, তাহাকে বাবুরা খানসামা ও বেহারার পদ দিতেছেন। কাহার, কুর্ম্মী, ধানুক, রাজবংশী প্রভৃতি পশ্চিমের বহু স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য জাতিই বাঙ্গালায় আসিয়া জল চল হইয়া যাইতেছে। যে যজ্ঞোপবীতধারী উৎকলবাসী কলিকাতার ড্রেণে নামিতেছে, তাহারই জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজন, কেহ বা কোন বাবুর বাড়ীতে পাচক ব্রাহ্মণের কাজ করিতেছে, কেহ বা অন্য কোন বাবুর বাড়ীতে সর্দ্দার বেহারা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, এখন বাঙ্গালায় জলচল কে নহে? আমাদের চাকর চাকরাণী, পাচক পাচিকা—সবাই ত অজ্ঞাত-কুলশীল; আজ যে আমার বাড়ী কায়স্থ পরিচয় দিয়া খানসামার কাজ করিতেছে, কাল সে স্থানান্তরে যাইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া পাচক ব্রাহ্মণ হইতেছে। আমরা স্বয়ং এমন ঘটনার কথা জানি বলিয়াই কথাটা এত জোর করিয়া বলিলাম। দেখিয়াছি পশ্চিমের মুর্দ্দহর ও মঘইয়া ডোম জাতীয় হিন্দুস্থানী সকল কলিকাতায় আসিয়া, বাঙ্গালার অন্য বহু নগরে যাইয়া খানসামার কাজ করিতেছে; অজ্ঞাত-কুলশীল হিন্দুস্থানী, উড়ে, গুর্খা প্রভৃতিকে আমরা অম্লান মুখে জলচল করিয়া লইতেছি, আর যত গোল বাধাইব কেবল স্বদেশের অন্ত্যজ জাতি সকলকে

জল চল করিয়া লইতে? তখনি যত গোঁড়ামি আসিয়া ঘাড়ে চাপিবে, ইহ-পরকালের যত ভাবনা তখনই জাগিয়া উঠিবে।

"আর এক কথা; পূর্ব্বে বাঙ্গালার কোন উচ্চজাতীয় হিন্দুই দোকানের পক্কান্ন মিষ্টান্ন প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন না। জানাশোনা হালুইকর ব্রাহ্মণের দোকান না হইলে, কেহ কেহ দোকানের সন্দেশ রসগোল্লা পর্য্যন্ত আহার করিতেন না। এখন সকল দোকানের সিঙ্গাড়া, আলুর দম, লুচি কচুরি মিঠাই সন্দেশ—সর্ব্বস্বই আমাদের আহার্য্য হইয়াছে। চাকরে বাজার হইতে লুচি কচুরি আনিতেছে, হাঁসের ডিম আলুর দম আনিতেছে, আর আমরা অম্লান বদনে তাহাই খাইতেছি। রেল গাড়ীতে যাইতে হইলে, কেল্‌নারের সান্‌কী ভোগ যদি না খাই, কিন্তু পাঁড়েজীর রথ্যাধূলি-বিমণ্ডিত মক্ষিকাকুল-সমাচ্ছন্ন, পুরীতরকারী মালাই মিঠাই অসঙ্কুচিত চিত্তে ভোজন করিয়া হিন্দুয়ানী বজায় রাখিতেছি। ক্ষুধার চোটে আহারের সময়ে মনে থাকে না যে, রেল ষ্টেশনের খাবারওয়ালার খোঞ্চার খাবার কেলনারের প্রসাদ অপেক্ষা সহস্র গুণে হীন জঘন্য এবং মনুষ্যমাত্রেরই অভোজ্য ও অস্পৃশ্য। এ সব, যে হিন্দু সমাজে চলিতে পারে, এমন ব্যবহার করিয়া যাহারা বড়াই করে, তাহারা স্বদেশের নমঃশূদ্রগণকে ও মালীদিগকে, পোদ কৈবর্ত্ত সকলকে জল চল করিতে কেন আপত্তি করিবে? ইহার উপর সোডা লেমনেড আছে, বরফপানী আছে, আরও কত কি আছে। আমরা ত এক হিসাবে তেত্রিশ কোটি জাতিকে জল চল্ করিয়া লইয়াছি। যত গোল কি ঘরের কয়জনকে জল চল্ করিতে ঘটিতেছে! বিবাহের ভোজে, শ্রাদ্ধের পংক্তিভোজনে, দুর্গোৎসবের প্রসাদ ভক্ষণে, উড়ে হিন্দুস্থানী গুর্খা খানসামারা ঘটে ঘটে জল দিয়া যাইতেছে, মেদিনীপুর-বাঁকুড়ার, কটক-যাজপুরের অজ্ঞাতকুলশীল পাচকে লুচি ভাজিয়া পাতে পাতে দিয়া যাইতেছে; বাঙ্গালার সকল জেলার অপরিচিতা চাকরাণীরা বাটনা বাঁটিতেছে, তরকারী ধুইয়া

দিতেছে, মা-ঠাকুরাণীদের শুচীবাইয়ের জল যোগাইতেছে, ঠাকুর ঘর ধুইতেছে, পুষ্পপাত্র মার্জ্জনা করিতেছে ; ঘরের বাহিরের সকল কাজই অপরিচিত অপরিচিতার দ্বারা সুসম্পন্ন হইতেছে ! ইহাতে কাহারও জাতি যায় না' কাহারও পরকালে কাঁটা—পড়ে না, কাহারও পূজাপার্ব্বণ, শ্রাদ্ধ শান্তি নষ্ট হয় না। আর যত সর্ব্বনাশ ঘটিবে বলিয়া-কহিয়া বাঙ্গালার গোটাকয়েক জাতিকে জল চল করিতে ? বলিহারী !

"গোস্বামী প্রভুগণও এখন আর অন্ত্যজ জাতির গুরুগিরি করিতে চাহেন না, বেশ্যাকে দীক্ষা দিতে লজ্জা বোধ করেন। ফলে, বাঙ্গালার বহু শূদ্রজাতি এখন এই নবীন সভ্যতার—কর্কশ জাতিভেদের প্রভাবে গুরু পুরোহিত বর্জ্জিত হইয়া পড়িতেছে। যাহাদের অর্থবল আছে, তাহারা টাকার জোরে বিদ্যাভূষণ তর্কালঙ্কারকে গুরু পুরোহিতের পদে বরণ করিতেছে। যাহারা দরিদ্র গৃহস্থ, তাহাদের দশবিধ সংস্কারের কোন সংস্কারই হইতেছে না। তাই বাঙ্গালার অন্ত্যজ জাতি সকল এখন দলে দলে মুসলমান হইতেছে, খৃষ্টান সাজিতেছে। সমাজ ও ধর্ম্ম পাইবার জন্য, ভদ্র সাজিবার বাসনায়—সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেছে। এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রবাহকে রোধ করিবার জন্য যদি আমরা বলি যে অন্ত্যজ জাতি সকলকে জলচল করিয়া লও, তাহা হইলে অমনি শাস্ত্র, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মনু পরাশর প্রভৃতির দোহাই দিয়া গোঁড়ামীর ক্লেদ কর্দ্দম শত ধারায় বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাই বল্‌তে ইচ্ছা করে যে, ভাই ! নিজের বুকে হাত দিয়া গোঁড়ামীর ডঙ্কা মারিও, নিজের ব্যবহারের কথা মনে করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিও, সমাজের চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া আমাদের কথার প্রতিবাদ করিও।"

এই জলচল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রসিক লাল রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

"একই জাতি বিভিন্ন প্রদেশে আচরণীয় ও অনাচরণীয় বলিয়া গৃহীত।

গোপ বা গোয়ালা জাতি পূর্ব্ববঙ্গে আচরণীয় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের জলচল নাই। যশোহরের গোয়ালারা গরু দাগাইয়া অনাচরণীয় হইয়াছে। বিহারে কাহার জাতির জল চল আছে, কিন্তু বঙ্গে কাহার অচল। লোকে এদেশে হাড়ি ও কাহার এক পর্য্যায়ে ফেলিয়া কাহারকে হীনচক্ষে দেখিয়া থাকে। কিন্তু বিহারী কাহার আমাদের চক্ষে 'কুলিন', তাহাদের জল খাইতে আমরা ইতস্ততঃ করি না। ছোটনাগপুরে কাহার মুর্গী ও ইন্দুরের মাংস ধ্বংস করিয়াও উচ্চ শ্রেণীর আচরণীয়। চাষী কৈবর্ত্তেরাও স্থান বিশেষে অচল। বিহারের কুম্ভকার অপেক্ষা বঙ্গের কুম্ভকারের সামাজিক অবস্থা উন্নত। বিহারে তাহাদের জল উচ্চ বর্ণের অব্যবহার্য্য।" (সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী তেঁতুলিয়া, হরিপুর, চাঁদপুর প্রভৃতি অঞ্চলের পাটি প্রস্তুত কারিগণ আচরণীয় কিন্তু ময়মনসিংহে তাহারা অনাচরণীয় অচল।) "সুরা ব্যবসায়ী (বলিয়া) শৌণ্ডিক জাতি অনাচরণীয়। বঙ্গে, বিহারে এবং ভারতের সর্ব্বত্রই হিন্দু সমাজে তাঁহারা অনাচরণীয়।" (কিন্তু সুরা বা মদ অচল নহে। সুরা বিক্রয় অপরাধে শুঁড়ী পতিত, কিন্তু সুরা পানে কেহ পতিত নহেন যত দোষ বিক্রয়ে, পানে নহে।) "স্বর্ণকার (ও সুবর্ণবণিক) অচল কিন্তু কর্ম্মকারের (লৌহকার) জল চল। রাউতির (চুণ বিক্রয়কারী চূর্ণকার) জল দ্বারা প্রস্তুত চুণ পানের সঙ্গে সকলেরই মুখে যায়, কিন্তু তাহার জল কেহই স্পর্শ করে না।" (অর্থাৎ চুণ মিশ্রিত জল চলিবে কিন্তু শুধু জল অচল—সে জলে ব্রাহ্মণাদির ব্রহ্মতজ্বিত লোপ পায় ;) নমঃশূদ্র, মালী, সাহা, সুবর্ণবণিক, সূত্রধরের জল অচল—কিন্তু সেই জলে সোডা মিশাইয়া দিলে কিংবা জলকে বরফে পরিণত করিয়া দিলে করিম চাচার হাত হইতে লইয়া খাইতে কাহারও আপত্তি নাই – সমাজের বাধা নাই। মুসলমান কলুর তৈলে সকলেই হাড়িতে ভোজ্য সামগ্রী ভর্জ্জিত করে, কিন্তু তাহার জল কাহারও টিপিটকে যুক্ত হইতে পারে না।" সকলেই বোধ হয় জানেন তৈল নির্য্যাস করিবার কলে (গাছে) জল না দিলে—শুধু সরিষা

ও তিল হইতে কখনও তৈল বাহির হয় না। সে জলে দোষ হয় না; যত দোষ জল বেচারীর একা একা থাকিলে। শুধু জলে যত দোষ, মিশ্রিত হইলে কোন দোষ নাই। "মৎস্য ব্যবসায়ী ধীবর ও কৈবর্ত্তগণ অস্পৃশ্য, কিন্তু বঙ্গে মৎস্য অস্পৃশ্য নহে।" আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, সুরা বা মৎস্য রূপ অপবিত্র ও অশুদ্ধ সামগ্রী বিক্রয় করিয়া—সাধারণের পানে ও আহারে প্রশ্রয় দেওয়া ও সহায়তা করার অপরাধে শুঁড়ি ও ধীবর পতিত কিন্তু উহা পানে ও আহারে কেহ পতিত হইতেছেন না। মৎস্য ও সুরা পানে জাতি যায় না, তাহার বিক্রয়ে জাতি যায়। অর্থাৎ—সমাজ বলিতে চাহে গো বিক্রয়ে জাতি যাইবে কিন্তু গো ভক্ষণে কোন দোষ হইবে না—পতিত হইতে হইবে না! "বিহারে আহীর ও কোন কোন স্থলে রাজপুতগণও বরাহ মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে—তথাপি তাহারা আচরণীয় হিন্দু—" আর বঙ্গে সাহা সুবর্ণবণিক মাহিষ্য নমঃশূদ্র মালী অচল অস্পৃশ্য। "বিহারে জলচল জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে অনাচরণীয় অস্পৃশ্য জাতির মধ্যেও বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই। * * * অতএব সামাজিক রীতিনীতি ও ও খাদ্যাখাদের বিচার দ্বারাও অনাচরণীয় হইবার একমাত্র কারণ নহে।" * * * "পঞ্জাবে ডালরুটী বাজারে ক্রয় করিয়া 'ক্ষত্রি' রাজপুত ও কায়স্থাদি ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্যবহার করে। * * মাদ্রাজ অঞ্চলে ব্রাহ্মণেতর হিন্দুর গৃহে পালিত কুক্কুট দৃষ্ট হয়। * * ইংরাজ সংসর্গে, ইংরাজী শিক্ষায়, ইংরাজী আইনে আমাদিগের মতের, চিন্তার, বৃত্তির, ব্যবহারের, ধর্ম্মের গতিবিধির ও ইচ্ছার স্বাধীনতা শিক্ষা হইয়াছে। প্রভাতে তরুণ অরুণ দীপ্তির প্রথম প্রকাশে বিহঙ্গকুল যেমন উল্লাস ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণকরে, ধর্ম্ম সমাজ বাণিজ্য সাহিত্য চিন্তায় ও কর্ম্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভের 'বারতা, শুনিয়া আশায় উৎফুল্ল হইয়া বঙ্গবাসী সেইরূপ জয়ধ্বনি করিয়াছিল। সেই আনন্দধ্বনি কবির কণ্ঠে, বক্তার বাগ্মিতায়, লেখকের লেখনীতে, কর্ম্মীর কর্ম্মে,

দর্শকের সমালোচনায় শতমুখে সহস্র ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজের আইন সাম্যবাদ ঘোষণা করিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকারের ধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে। এখন সমাজের শাসন অপরাধজনক, ধর্ম্মের উন্মাদনা অযৌক্তিক ও আইন বিরোধী। অতএব হিন্দু সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজের শিক্ষা ও সভ্যতা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে আপামর সাধারণের মধ্যে বিতরিত হইতেছে।" * * * "ইংরাজ যে সাম্যবাদ ঘোষণা করিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ও বর্ণাশ্রম প্রথার মূলে যুগপৎ কুঠারাঘাত করিয়াছে, ইয়ুরোপের সভ্যতা আশিয়াকে অভিভূত করিয়াছে, প্রাচীনের ভগ্নপ্রায় প্রাচীরের উপর নবীনের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছে। আরবের ভীম ঝঞ্জা-বাতের বেগ তুচ্ছ করিয়া যে হিন্দু দুর্গের গর্ব্বোন্নত শিখর গগন স্পর্শ করিয়াছিল, ইংরাজ যাদুকরের মলয় মারুতের মৃদুস্পর্শে তাহা আলাদিনের অট্টালিকার ন্যায় শূন্যে মিলিয়া যাইতেছে, ইংরাজের যুক্তিবাদ ভারতের শ্রদ্ধাবাদকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। ইংরাজের শিক্ষা, সভ্যতা ও আদর্শের তরঙ্গ স্তরে স্তরে সমাজের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছে।" * * "আমাদের দেশে রেলে, ট্রামে, জাহাজে, বিদ্যালয়ে, কর্ম্মক্ষেত্রে ও রাজদ্বারে জন সাধারণের তুল্যাধিকার। জাতিগত পদমর্য্যাদা—অর্থ ও পদজনিত সম্মানের নিকট পরাজিত হইয়া পল্লী প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাঞ্ছিত হইয়াছে। খৃষ্টমিশনারিগণ এবং হোটেল, চায়ের দোকান, খাবারের দোকান, মেস, সুরালয়, বারাঙ্গনা গৃহ প্রভৃতি সাম্যবাদ প্রচার করিয়া সন্ধুক্ষিত বিপ্লবানলে ইন্ধন প্রদান করিতেছে।"* "বৃহৎ নগরীতে জীবন সংগ্রামের

---

* এখন পরকালের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও শাসন করিতে পারিবে না; সমাজ শাসনের পুরাতন পদ্ধতি একঘরিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কাহাকেও অনুগত করিতে পারিবে না। সে পক্ষে পীনাল কোড তোমার বিরোধী। * * আজি পর্য্যন্ত সর্ব্বভুক্ অভোজ্য ভোজী ব্রাহ্মণ সমাজে অপাংক্তেয় হয় নাই। শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়া ১৩২১, আষাঢ়.

তীব্রতা আচরণীয় ও অনাচরণীয় হিন্দুকে সমসূত্রে গাঁথিয়া এক নূতন জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।" "স্বাধীনতার যুগে সকলেই স্ব-স্ব প্রধান, কেহ কাহারও শাসন ও প্রভুত্ব স্বীকার করিতে চাহেনা। এখন উচ্চ নীচ প্রত্যেকে আপন আপন অধিকার কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া বুঝিয়া লইতে ব্যস্ত। প্রতিপদে প্রতিকার্য্যে যুক্তির অবতারণা না করিলে কেহ ব্যবস্থার নিকট মস্তক অবনত করে না। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার আসিতে পারে; কিন্তু তাহা ব্যবস্থার নামে যথেচ্ছাচার অপেক্ষা শতগুণে অধিকতর বাঞ্ছনীয় ও মঙ্গলজনক নহে কি? এখন আমাদের সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া হিন্দু সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্খলিত হইতেছে, সমাজে বিশৃঙ্খলা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচার প্রবেশ করিয়াছে। অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইলেও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যকতা সত্ত্বেও হইতেছে না। পল্লীতে সমাজ-পতি নাই, ব্যবস্থাকার ব্রাহ্মণ নাই।* সমাজহিতৈষী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের প্রাচীন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না। তাঁহারাও পরমার্থ অপেক্ষা অর্থ, যশঃ, মান, পদমর্য্যাদা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রসূত সুখ ভোগের কাঙ্গাল হইয়া পুত্র পৌত্রদিগকে ইংরাজী ভাবাপন্ন করিয়া গৌরব ও আত্ম প্রসাদ অনুভব করিতেছেন। মহামহোপাধ্যায়গণের পুত্রগণ এখন কেহ উকীল—ইংরাজীর অধ্যাপক, ডাক্তার কেহ বা কৃষিতত্ত্ববিদ্ হইতেছেন। জনৈক বিশিষ্ট বংশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বয়ং সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়াও তাঁহাদের পুত্রদিগকে টোলের চতুঃসীমা স্পর্শ করিতে দেন নাই, খাঁটি ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন।" (মালা-তিলকধারী, মুণ্ডিত-মস্তক দীর্ঘ-শিখা-সূত্রধারী টোলের শিক্ষিত জামাতাকে কন্যাদান না করিয়া হ্যাট কোটধারী চস্‌মা আঁটা খাটো দরশন স্কুল বা কলেজের

---

* আমরা—যাহারা ছত্রিশ জাতের সহিত একাসনে বসিয়া একাদিক্রমে দু দশ বৎসর-কাল ইংরাজী শিখিয়া এম্ এ, বি এ, পাশ হইয়া বাবু সাজিয়াছি আমরা কেহই ব্রাহ্মণ নহি। শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, বিজয়া, ১৩২১, আষাঢ়, ৮৮২ পৃঃ।

ছাত্রগণকেই সকলে কন্যাদান করিতেছেন। কন্যাও আর পূর্ব্বোক্ত বরের অনুরাগিনী নহেন। শতকরা ৮০ জন ব্রাহ্মণ সন্তান আপনাদের জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছেন।) সুতরাং "যিনি স্বয়ং অসিদ্ধ তিনি অপরকে কিরূপে সাধনার পথ দেখাইবেন ?"

"হিন্দু সমাজে এখন নায়ক ও পরিচালক নাই। সুতরাং বিষম দুর্দ্দিনে বাতাবর্ত্ত ও সলিলাবর্ত্তের সন্ধিস্থানে আমাদের কর্ণধারহীন বিপ্লবতরঙ্গ-তাড়িত, জীর্ণ সমাজতরি মগ্ন প্রায়। আরোহিগণ কেহ নিদ্রিত সংজ্ঞাহীন, কেহ 'আত্মবিস্মৃত', কেহ উন্মত্তের ন্যায় কলহমত্ত ; আত্মরক্ষার চিন্তা ও চেষ্টা কাহারও নাই। সমাজের শিরোমুকুট ব্রাহ্মণ বর্ণে-তরের উপর নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ হইয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রতিকার্য্যে দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। যে সকল বর্ণ লইয়া হিন্দুসমাজ গঠিত, তাহারা সকলেই আপন আপন শ্রেণীর প্রাধান্য ঘোষণা করিয়া সামাজিক মর্য্যাদা দাবী করিতেছে। এই সময় দারুণ সমস্যার মীমাংসা করিতে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ সহানুভূতি ও সুবিবেচনা লইয়া অগ্রসর না হইলে অচিরাৎ হিন্দুসমাজের শিরে অশনি পাত হওয়া অসম্ভব নহে।"

"বিপ্লবের সূচনায় যুগীজাতি উপবীত গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে 'ব্রাহ্মণযোগী' বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই উথানের চেষ্টা ও সামাজিক অধিকার লাভের আশঙ্কা কেবল পশু বলে চাপিয়া রাখিবার আয়োজন করা হইয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজের সাম্যবাদ এবং বিজয় কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের উদারনীতি কতক পরিমাণে হিন্দু সমাজের বিপ্লব তরঙ্গের গতিরোধ করিতে পারিয়াছে। ইঁহারা না থাকিলে ব্রাহ্মণের বজ্র আঁটুনিতে সমাজ গ্রন্থি একবারেই বা ফস্‌কিয়া যাইত। বৈদ্য ও যুগীদিগের উপবীত গ্রহণের যে সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা ঐ খানেই শেষ

হয় নাই। কায়স্থগণও উপবীত গ্রহণ করিয়া পশ্চিম দেশীয় স্বজাতি-দিগের সহিত মিশিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিহার ও পশ্চিমাঞ্চলের দ্বারবঙ্গাধিপ প্রমুখ ব্রাহ্মণগণের তাহাতে সহানুভূতি থাকিলেও বঙ্গীয় তথা কথিত সমাজনায়ক ব্রাহ্মণগণ তাহার ঘোরতর বিরোধী হইয়াছেন। রাজপুত, রাজবংশী, কুর্ম্মী, কাহার, আহীর, কর্ম্মকার, বণিক, তৈলী, মাহিষ্য প্রভৃতি সকল জাতি আপন ২ অধিকার ও উন্নতির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ইহা অশুভ লক্ষণ নহে। সুচতুর দক্ষ পরিচালক থাকিলে এই সময় নিদ্রোত্থিত হিন্দু সমাজকে নূতন শক্তিতে, নূতন মন্ত্রে, নূতন ভাবে গঠন করিতে পারিতেন।" "ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ আভিজাত্য গৌরবে স্ফীত হইয়া নিম্ন শ্রেণীকে পদদলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা আইনের অভয় পাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ সুদৃঢ় বৃত্ত গঠিত করিয়া স্ব স্ব জাতির ও বর্ণের ব্রাহ্মণ লইয়া নূতন শাখা হিন্দু সমাজ স্থাপন করিয়াছে। এখন প্রত্যেকেই বলিতে পারে আমরাই উচ্চবর্ণ। * * ব্রাহ্মণ মাহিষ্যের জল স্পর্শ করিবে না, মাহিষ্যও ব্রাহ্মণের জল অস্পৃশ্য বলিয়া অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে। 'তাহারা জলচল' জাতি হইবার জন্য সমাজে আবেদন করিয়া যদি ফল না পায়, তাহা হইলে এই মুমূর্ষু সমাজকে অক্ষম অযোগ্য ও পক্ষপাতী বলিয়া ঘৃণা করা তাহাদের পক্ষে অন্যায় ও অসঙ্গত হইবে না। * * এক মেদিনীপুর জেলার একপ্রান্তে মাহিষ্যগণ আচরণীয় এবং অপর প্রান্তে তাহাদের জলচল নাই। যে সকল ব্রাহ্মণেরা তাহাদের জল ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারা কি অপর প্রান্তবাসী স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের সহিত পান ভোজন ও বৈবাহিক আদান প্রদানাদি করিতে কোন প্রকার কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন? তাহাতে কি তাঁহাদের জাতি যাইতেছে না? এরূপ গায়ের জোরের দেশাচার 'দুরাচার' মাত্র, উহা যতশীঘ্র তিরোহিত হয় ততই আমাদিগের ও আমাদের উত্তর কালীয় বংশধরদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক। ইহাপেক্ষাও অধিকতর রহস্যজনক কথা

এই যে অনেকস্থানে মাহিষ্য (চাষী-কৈবর্ত্ত) জাতি আচরণীয়, কিন্তু তাহাদের পুরোহিতের জল ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চবর্ণের অব্যবহার্য্য। মাহিষ্যগণ পুরোহিতের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়া শুদ্ধজাতি আর তাহাদের গুরু পুরোহিত অশুদ্ধজাতি; বলিহারি দেশাচারের যৌক্তিকতায়! বেলফুল (শেফালিকা, জবা প্রভৃতি) চণ্ডালে স্পর্শ করিলে তাহা দেবার্চ্চনার অযোগ্য, কিন্তু সকণ্টক মৃণাল হইতে চণ্ডাল কর্ত্তৃক আহৃত কমল (বা সকণ্টক বিল্ব পত্র) দেবতার পরম প্রিয়। গরজের বালাই লইয়া মরি। ব্রাহ্মণের ন্যায় অশৌচ পালনকারী কৃষিজীবী নমঃশূদ্রগণ হিন্দু সমাজের ভিত্তি। মুসলমানের সহিত হিন্দুর বিবাদে তাহারা ও মাহিষ্যজাতি হিন্দুর দক্ষিণ হস্ত যথা সর্ব্বস্ব ছিল। কায়স্থের এবং স্থান বিশেষে ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে তাহারা দৈহিক বল দ্বারা আততায়ীর দৈহিক বলের সম্মুখীন হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপালন করিয়াছিল। কিন্তু এত করিয়াও তাহারা পতিত ও অস্পৃশ্য। এতকাল তাহারা সকল অনাদর উপেক্ষা নীরবে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু এখন ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া তাহারা উচ্চবর্ণের 'বিদ্যা' টের পাইয়াছে। তাহাদিগকে যাহারা এতকাল ছোট লোক বলিত, এখন টেবিল ঘুরাইয়া তাহাদিগকে উহারা ছোটলোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অর্থ বলে, শক্তিবলে, জন বলে ইহারা স্বাধীন ও প্রধান। কিন্তু সমাজের উচ্চবর্ণ সকল আপন লইয়া এতদূর ব্যস্ত যে পরের ভাবনা ভাবিবার অবসর তাঁহাদের আদৌ নাই। কাজেই তাহারা আপন আপন ভাবনা নিজেই ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। * * আমাদের সহানুভূতির জন্য অপেক্ষা করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া নাই। তাহারা দেখিতেছে—

(ক) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী শিক্ষায় অনুরক্ত হইয়া ইংরাজী শিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর সহিত সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

(খ) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আত্মীয় কুটুম্ব, পুত্র পৌত্র ও স্বজাতিগণ কলের

জল, হোটেলের অন্ন, বিদেশীয় অচল জাতির জল, চায়ের দোকানের উচ্ছিষ্ট ব্যবহার ও গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না।

(গ) * * * *

(ঘ) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের সন্তান, সন্ততি আত্মীয় কুটুম্বগণ অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জাতীয় যুবতীগণের সহিত ব্যভিচার করিতে ও গোপনে তাহাদের হাতের জল (ও তৈয়ারি পিষ্টকাদি) ব্যবহার করিতে আপত্তি করিতেছেন না।

(ঙ) ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চবর্ণ গোপনে অখাদ্য ভোজন ও যবনান্ন গ্রহণ করিয়াও জাতিচ্যুত হইতেছে না।

(চ) * (ছ) * (জ) * * *

(ঝ) ক্ষমতাপন্ন পদস্থধনী ব্যক্তির নিকট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ স্পর্শদোষ বিচার করিতেছেন না। (ঞ)

(ট) এক প্রদেশের অনাচরণীয় জাতি অন্য প্রদেশে আচরণীয়।

(ড) পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সদাচার, সচ্চরিত্র এবং সৎবৃত্তি অবলম্বী হইলেও অনাচরণীয় জাতি অস্পৃশ্য ও অশুদ্ধ। কিন্তু নিতান্ত ভ্রষ্টাচার, দুশ্চরিত্র, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন ও হীনবৃত্তি পরায়ণ উচ্চ বর্ণজাত ব্যক্তি শুদ্ধ ও আচরণীয়।

নিম্নশ্রেণীর অনাচরণীয় হিন্দুগণ দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের সহিত তাহাদের কোন প্রকার সামাজিক সংশ্রব নাই। ব্রাহ্মণাদি শীর্ষস্থানীয় হিন্দুগণ সিন্ধবাদ নাবিকের স্কন্ধারূঢ় সেই বৃদ্ধের ন্যায় তাহাদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তাহাদিগের উপর অযথা সামাজিক অত্যাচার করিতেছেন। সে অত্যাচারের মূলে যুক্তি নাই, বিচার নাই, মায়া মমতা নাই, ধর্ম্ম নাই উদ্দেশ্য নাই—আছে কেবল অন্ধ দেশাচার—রাক্ষসের বিভীষিকা।

মুসলমান-যুগে বহু হিন্দু নানা কারণে ধর্ম্মত্যাগ করিয়া রাজধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সকলকেই যে বলপূর্ব্বক ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল তাহা নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে সামাজিক অত্যাচারের ব্যতিক্রম হওয়াতে অনেক হিন্দু সমাজচ্যুত হইয়া মুসলমান সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে কাহারও পিরুলী অপবাদ হইয়াছিল। (আজকাল যাঁহারা মৌলবী মৌলানা সাজিয়া বক্তা লেখক হইয়া মুসলমান ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছেন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রায় সকলেই আমাদেরই ভাই ছিল, আমাদেরই অত্যাচারে তাহারা ইস্‌লামের শরণাপন্ন হইয়াছিল।) এতদ্-ভিন্ন পার্থিব সুবিধা ও লাভালাভের বিবেচনায়ও অনেকে স্বেচ্ছায় পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। (নমঃশূদ্র, মালী প্রভৃতি জাতিগণ নাপিত, বেহারা ও ধোপা পাইবে না কিন্তু সে যদি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান কিংবা খৃষ্টান হয়, তবে সে তাহার সকল গুলিই পাইবে। সরলা নমঃশূদ্রানী বা বিমলা মালিনী যতক্ষণ পর্য্যন্ত হিন্দু থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে নাপিত বেহারা পাইবে না কিন্তু যেই মাত্র সে মুসলমানের সহিত নিকা বসিয়া মুসলমানী হইবে বা বেশ্যা হইবে তখন সে সকলই পাইবে। কত নিম্ন শ্রেণী আছে যাহাদের গুরু পুরোহিত নাই। আর একটী প্রধান কারণ ব্রাহ্মণেতর শতকরা ৯৪ জন হিন্দুকে পূজা ও বেদাধিকার হইতে বঞ্চিত করা। এই সব গুরুতর গুরুতর অবিচারে দলে দলে লোক মুসলমান হইয়া গিয়াছিল— এবং এখন খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে।) "পরলোকের কথা, মুক্তির কথা, সাম্যরাজ্য স্বর্গের কথা, সাধন মার্গের কথা, ধর্ম্মের কথা তাহারা যাহার নিকট শুনিয়া চিত্তে শান্তিলাভ করিল, তাহারই চরণ প্রান্তে তাহারা ভক্তিভরে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী, পীর, ফকীর, গাজি, সাধু, যিনি আদর্শ জীবন লইয়া আসিয়া প্রেম ও দয়া বিনিময়ে তাহাদের হৃদ্‌রাজ্য অধিকার করিলেন, তাহারা তাঁহারই চরণ তলে আত্ম বিক্রয় করিল। এইরূপে অনেক নিম্ন

শ্রেণীর হিন্দু জাতিভেদের অত্যাচার হইতে মুক্ত হইয়া (বৌদ্ধধর্ম) ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্যের চরণ প্রান্তে জাতিভেদ বিসর্জ্জন দিয়াছিল। এখন ও দলে দলে নমঃশূদ্র ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। ফরিদপুর জিলার গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরের সন্নিকটে বৃহৎ বৃহৎ খৃষ্টপল্লী স্থাপিত হইয়াছে। 'বুনো খাজর' হিন্দুর দ্বারে ধর্ম্মের ভিখারী হইয়া ও রিক্ত হস্তে ফিরিয়া খৃষ্টমন্দিরের ক্রোড়ে সমাদর লাভ করিতেছে। রাঁচিতে শত শত "মুণ্ডা কোল" খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। (মান্দ্রাজের পারিয়াগণ দলে দলে খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে)। হিন্দু সমাজ আর কিছুদিন পরে ভীম কর্ত্তৃক নিহত কীচক কবন্ধের ন্যায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হীন কুষ্মাণ্ডাকার ধারণ করিবে। অথবা সকল যাইয়া কেবল সমাজ তুণ্ড ব্রাহ্মণ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। * * * অনাচরণীয় জাতিদিগের পক্ষে অযোগ্য উচ্চবর্ণের অত্যাচার এতদূর অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে এক্ষণে তাহারা বিদ্রোহী হইতে বাধ্য হইয়াছে। তাহারা সামাজিক বিধি ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া বলপূর্ব্বক আচরণীয় হইবার চেষ্টা করিতেছে। (তাহারা সংখ্যাতেও ত কম নহে—শতকরা ৭৪ জন হিন্দুই অনাচরণীয় অস্পৃশ্য,—অর্দ্ধেকের বেশীই তাহারা)। "প্রকৃতির প্রতিশোধ" আরম্ভ হইয়াছে।"

"আমাদের তলে তলে সব চলে,' মুখপাত দুরস্ত করিয়া আর কতদিন সমাজের খোলস বজায় রাখা যাইতে পারে? মুসলমান দুধে জল দিলে তাহা ক্রয় করিতে ও সেই জল মিশ্রিত দুগ্ধ রন্ধন শালায় প্রবেশ করাইতে নিষেধ নাই, কিন্তু নমঃশূদ্রের জলে হাত পা ধুইতেও অব্যবহার্য্য। খেজুর রস জ্বাল দিতে দিতে তাহাতে চিতই পিঠা ও পুঁটলীতে বাঁধিয়া চাউল সিদ্ধ করিয়া মুসলমানের জানানা ব্যক্তি বাল বাচ্চাকে খাইতে দেয়। সেই গুড় উচ্চবর্ণের হিন্দুর (ও দেবতা বিগ্রহের) অব্যবহার্য্য নহে। মুসলমান ও

নমঃশূদ্রাদি অনাচরণীয় হিন্দু ব্যবসায়ীরা ধান সিদ্ধ করিয়া তাহা হইতে চাউল বাহির করিয়া বাজারে বিক্রয় করিলে আব্রাহ্মণ চণ্ডাল উচ্চ নিম্ন সকলেই তাহা ক্রয় করিয়া সিদ্ধ চাউল দ্বিতীয়বার সিদ্ধ করিয়া তৎদ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারেন। কিন্তু অপর জাতিতে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণের পক্কান্নও অখাদ্য। গব্য বা মহিষ ঘৃতের সহিত কত জীব জন্তুর বসা *

---

* "সঞ্জীবনীতে প্রকাশ,...গোবিন্দ লীল নামে একব্যক্তি মানিকতলা মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকায় একটী চর্ব্বির কারখানা খুলিবার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি চাহিয়াছিল। সে দরখাস্তে লিখিয়াছিল যে, চর্ব্বির ব্যবসা অতি উত্তম, ইহাতে কোন দুর্গন্ধ নাই, ইহা মানুষের খাদ্য ইত্যাদি। মানিকতলা মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি মিঃ আসগর ঐ মিউনিসিপ্যালিটীর জনৈক কমিশনার মৌলবী খলিল শাহমদকে কারখানার খবর জানিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। মৌলবী সাহেব কারখানা পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"The factory to be started is meant for manufacturing adulterated Ghee made up of ground-nut oil and fat of animals such as kine, goat, swine, sheep, even snakes and lizards and the applicant admitted that the product is made for human consumption."

"অর্থাৎ এই কারখানা ভেজাল ঘৃত প্রস্তুতের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঐ ঘৃত চিনাবাদামের তৈল ও গরু ছাগল শূকর, ভেড়া এমন কি সাপ ও টিকটিকির চর্ব্বি সংযোগে প্রস্তুত হইবে। দরখাস্তকারী স্বীকার করিয়াছে যে মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্যই উহা প্রস্তুত করা হইবে।" একথা শুনিলে কি কাণে আঙ্গুল দিতে ইচ্ছা হয় না? মৌলবী সাহেব আরও লিখিয়াছেন—

The process necessitates the accumulation of big pieces of large quantities of cattle bones for producing marrow which is mixed with the concoction to give it a granulated appearance of Ghee

অর্থাৎ...প্রাণিসমূহের অস্থির অভ্যন্তরস্থ মজ্জা মিশাইলে চর্ব্বির মধ্যে খাঁটী ঘৃতের মত দানা বাঁধে, সুতরাং কারখানার ভিতর অনেক হাড় মজুত রাখিতে হইবে। বুঝুন ব্যাপার

(চর্ব্বি) মিশিয়া হবিষ্য শুদ্ধ করিতেছে। ইহাতে আমাদের দৃক্‌পাত নাই। কিন্তু আমাদেরই—দেহের দেহ, প্রাণের প্রাণ নিম্নস্তরের হিন্দুর জল ব্যবহার করিতে আমরা ইতস্ততঃ করি। দোকানের কারি, চপ্‌ রোষ্ট কাট্‌লেট, কোর্ম্মা, কোপ্তা, ডিম মামলেট উচ্ছিষ্ট পাত্রে উচ্ছিষ্ট স্থানে ছত্রিশ জাতির সহিত একাসনে বসিয়া 'উড়াইতে' আমাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয় না, যত দোষ কেবল পরিচয় পাইলে। "ডুব দিয়া জল খাইলে একাদশীর পিতামহও টের পায় না।"

"আমরা আর পুঁথি বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তনে সামাজিক ব্যবহার, সংস্কার ও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আজকাল এমন এক বাতাস বহিতেছে যে হিন্দু সমাজের হিতৈষী ক্ষমতাশালী পরিচালকগণ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শাস্ত্রব্যবসায়িগণ সুবিচার করিয়া নিম্ন শ্রেণীকে কিছু কিছু অধিকার প্রদান না করিলে ভবিষ্যতে আমাদের মঙ্গলের আশা নাই। এই সকল অধিকারের মধ্যে আমাদের মতে সর্ব্ব প্রধান অধিকার 'জলচল'।* (সুবর্ণবণিক, রাজবংশী, মাহিষ্য, সাহা, সচ্চাষী, যোগী কাপালী, নমঃশূদ্র, মালী, সূত্রধর, ঝালমাল প্রমুখ অনাচরণীয় ভ্রাতৃগণকে জলচল ও আচরণীয় করিতে হইবে।) সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে একটা একতা বন্ধন স্থাপন করিতে হইলে, হিন্দু জাতির সাধারণ উন্নতির জন্য সকল শ্রেণীর

কিরূপ গুরুতর। আজ কাল কলিকাতার বাজারে সাধারণতঃ যে ঘৃত পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই এই জাতীয়, অথচ হিন্দু মুসলমান সকলেই ঘৃতের নামে অসঙ্কোচে গরু শূকরের চর্ব্বি গলাধঃকরণ করিতেছেন। ২১শে চৈত্র ১৩২১ সাল। বঙ্গবাসী।

* নিম্নস্থ জাতিব্যূহকে উন্নত করিতে হইবে। "মানুষের প্রদত্ত জল মানুষে পান করে না।" এই প্রকার অনৈসর্গিক ব্যবহার আর কতদিন ভারত সহ্য করিবে। সকলকেই আমরা জলচল করিয়া লইব। কায়স্থ এই বিষয়ে অগ্রগামী হইবেন। অর্থাৎ কায়স্থ প্রতিভা সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেবশর্ম্মা বি, এ, লিখিত পাদটীকা...আষাঢ় ১৩২১।

সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে হইলে আচরণীয় ও অনাচরণীয়, উচ্চ নিম্ন সকল বর্ণের হিন্দুর মধ্যে উদ্যম, চেষ্টা, সাধনা, অভিপ্রায় ও ইচ্ছা শক্তির যোগ চাই। তুমি আমাকে ঘৃণা কর, আমিও তোমাকে ঘৃণা করি। তুমি আমাকে ছোট লোক বল, আমিও তোমাকে ছোটলোক বলি। তুমি চরিত্র বলে, ধর্ম্ম বিশ্বাসে ব্রাহ্মণ না হইয়াও আমার নিকট ভক্তি শ্রদ্ধার দাবী কর এবং তৎপরিবর্ত্তে আমাকে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে রাখ আমিও তোমার চরিত্রহীনতার জন্য তোমাকে কৃপার পাত্র বলিয়া মনে করি। যতদিন আমাদের সমাজে এই প্রকার দ্বেষাদ্বেষী রেষারেষীর ভাব বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন আমাদের একতা বন্ধন অসম্ভব। ততদিন কিছুতেই আমাদের মধ্যে একতা সার্ব্বজনীন সামাজিক জীবনের সঞ্চার হইতে পারিবে না। প্রয়োজনের তাড়নায় আমাদিগকে প্রকাশ্যে বা গোপনে অনেক বিধি পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইতেছে। সময় থাকিতে সতর্ক হইয়া পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া নিম্ন শ্রেণীর উন্নয়নের (ও জলচল অধিকার দানের) প্রতি মনোযোগী হইলে এবং অনাচরণীয় জাতির প্রতি সমবেদনা দেখাইয়া তাহাদিগকে সামাজিক অধিকার প্রদান করিয়া আচরণীয় শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলে বোধ হয় পরকালে ভগবানের নিকট এবং ইহকালে স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির নিকট আমরা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইব না।"*

আশার সংবাদ!

নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টের যে চুম্বক দৈনিক কাগজ সমূহে বাহির হইয়াছে, তাহাতে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে :—

অস্পৃশ্যতা সমস্যা সম্বন্ধে মন্থর গতিতে দেশে একটী পরিবর্ত্তন আসিতেছে বলিয়া অনুভব করা যাইতেছে। যদিও সমস্যাটীর কঠিনতা ধর্ম্মবিশ্বাসের

* সমাজ সমস্যা...ভাদ্র ১৩২১ সাল : নব্যভারত।

সহিত জড়িত তথাপি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের বিরোধী মনোভাব তিরোহিত হইয়াছে এবং নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই ! ইহা আমরা সম্পূর্ণ স্বীকার করি যে, অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে অসহযোগ প্রচেষ্টা আমাদের জাতির যত লোককে যতটা সজাগ করিয়াছে অন্য কোন রাজনৈতিক ও ধার্ম্মিক প্রচেষ্টা তাহা করে নাই।

বস্তুতঃ অস্পৃশ্যতা জাতিভেদ প্রথার অঙ্গীভূত এবং উহার সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত ও অমানুষিক লক্ষণ বা উপসর্গ। অস্পৃশ্যতাকে বিনাশ করিতে হইলে বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথাকে ভাঙ্গিতে হইবে। তাহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। আমাদের দেশের জাতিভেদ প্রথা পাশ্চাত্য দেশের শ্রেণীবিভাগের মত নহে। কারণ পাশ্চাত্য শ্রেণী বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর একত্র আহার এবং ঔদ্বাহিক আদান প্রদানে ঐকান্তিক বাধা নাই। আমাদের জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার সঙ্গে বরং আমেরিকার শ্বেতকায় ও নিগ্রোদের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানের তুলনা করা যায়। যে কারণে আমরা আমেরিকাকে দোষ দেই, সেই কারণে আমাদের নিজেদেরও দোষ স্বীকার ও সংশোধন করিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। (অগ্রহায়ণ, প্রবাসী)

হিন্দু-মহাসভার প্রস্তাব

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ব্যবস্থা

বঙ্গীয়-হিন্দু-সভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন :—

প্রয়াগে কুম্ভমেলায় অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার বিশেষ অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের নানাস্থান হইতে সাধুসন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও প্রতিনিধি আগমন করিয়াছিলেন। কোহ্লাপুরের ও সারদামঠের শঙ্করাচার্য্যের সভাপতিত্বে ও উপস্থিতিতে সভার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে।

সভায় অস্পৃশ্যদোষ বর্জ্জন আর শুদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব পাশ পাইয়াছে। অনুন্নতগণ পাঠশালাতে ও দেব মন্দিরে প্রবেশে এবং কূপস্পর্শে যাহাতে কোনরূপে বাধা না পায়, তাহার জন্য হিন্দুসভা সকলকে অনুরোধ করিতেছেন।

বঙ্গদেশের হিন্দুসভার পক্ষ হইতে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র যাহাতে এই প্রস্তাবের রীতিমত আন্দোলন হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বঙ্গদেশে যদিও দক্ষিণ ভারতের ন্যায় ভেদভাব নাই, কালী মন্দিরে, শিব মন্দিরে, সকলেরই প্রবেশ অধিকার আছে, কিন্তু যাহাতে সাধারণে বিষ্ণু মন্দিরেও প্রবেশ করিতে পারে, তাহার জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে। পূজারীরা ইহাতে বাধাপ্রদান করিলে সত্যাগ্রহের ব্যবস্থা করা হইবে। আশা করা যায় অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুসভাও কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। (দৈনিক বসুমতী ২৫শে মাঘ ১৩৩০)

অস্পৃশ্যতা ও দিল্লীর হিন্দু সম্প্রদায়

গত ১লা জানুয়ারী সন্ধ্যায় দিল্লীর হিন্দু জন সাধারণের এক সভাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্পৃশ্যতা দোষ উত্তরোত্তর কমিতেছে দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। সভায় বলা হইয়াছে যে, তথা কথিত নীচজাতিকে কূপ হইতে জল তুলিতে দেওয়া ও এক মন্দিরে পূজা করিতে দেওয়া এবং তাহাদের ছেলেপিলেদের এক স্কুলে পড়িতে দেওয়ার সময় আসিয়াছে।

সাজাহানপুরে অপূর্ব্ব দৃশ্য

নিপীড়িত জাতির উন্নয়ন

গত ৫ই সেপ্টেম্বর স্বামী জীবারাম প্রায় ২০০ চামার এবং অন্যান্য বহু হিন্দুর এক সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। চামারেরা শিব মন্দিরে উপাসনা করে এবং সাজাহানপুরের কাচাকাটরা মহল্লার কূপ হইতে জল তোলে। গত ৬ই তারিখ বাহাদুরগঞ্জে চামারেরা মন্দিরে উপাসনা করে এবং কূপ হইতে

জল তোলে। ৭ই তারিখ বহু চামারের সম্মুখে পূজার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং চামারেরা "হর হর মহাদেব" ধ্বনির মধ্যে শিব পূজা সম্পন্ন করে। তাহারা মৃত জন্তুর মাংস আহার এবং মদ্যপান ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। (ইণ্ডিপেণ্ডেন্স)

অস্পৃশ্যতা ও গান্ধি-পুণ্যাহ

গঞ্জাম বহরমপুরের ১৯শে তারিখের খবরে প্রকাশ :—বিগত গান্ধি-পুণ্যাহে বহরমপুরের অন্ধ্র ও উৎকল জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক সভা আহুত হয়।

উৎকল কমিটী স্থানীয় অন্ত্যজ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে লইয়া এক শোভাযাত্রা বাহির করিয়া অস্পৃশ্য জাতিদের গ্রামে গমন করেন। সেখানে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সভা হয়। উক্ত বিদ্যালয় এবং স্বরাজ্যাশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীযুত জয়মঙ্গল রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। জয়মঙ্গল বাবু নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও নিঃসঙ্কোচে অস্পৃশ্য জাতির সহিত মেলামেশা করিয়া তাহাদের উন্নতি বিধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতীয় সাধু মহামণ্ডল
মাঘমেলার বিশেষ অধিবেশন

নিখিল ভারত-সাধু মহামণ্ডলের মাঘমেলার বিশেষ অধিবেশন গত ২৯শে জানুয়ারী হইতে এলাহাবাদে আরম্ভ হইয়াছে। জগৎগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্বামী ভারতীকৃষ্ণতীর্থ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় প্রস্তাব হয়, যেহেতু ভারতীয় সাধুগণের বিবিধ সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা নিজেদের আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন না, সেই জন্য সাধুগণকে একতাবদ্ধ হইতে হইবে।

ভারতের মধ্যে হিন্দুগণই সংখ্যা, জ্ঞান ও অর্থসম্পদে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দের অভাবে তাহাদের সমস্ত সদ্‌গুণই নষ্ট

হইয়া যাইতেছে। বিধর্ম্মীরা তাহাদের উপর অত্যাচার করিতেছে, এমন কি তাহাদের দেবমন্দিরাদিও অপবিত্র ও ধ্বংস করিতেছে। সেই জন্য মহামণ্ডল অনুরোধ করিতেছে যে, হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্ত হিন্দুদিগের মধ্যে যেন সদ্ভাব স্থাপিত হয় এবং সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়।

হদিদিগকে ক্ষত্রিয় করণ

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর অঞ্চলে হদি নামক এক জাতি বাস করে। ইহাদের নাক চেপটা, শরীর বলিষ্ঠ। কিছু দিন হইল ইহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় রাজা হৈহয়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেছে। তবু হিন্দুসমাজ ইহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে রাখিতে ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, ময়মনসিংহে হিন্দুহিতৈষিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিধবাদের বিবাহ দেওয়া, অবনত শ্রেণীকে উন্নত করা, অস্পৃশ্যকে আচরণীয় করা এই সভার উদ্দেশ্য। সভার উদ্যোগে ময়মনসিংহ টাউনহলে ৫০০ হদিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং তাহারা উপবীত ধারণ করিয়াছে। কেহ কেহ এই কার্য্যের বিরোধী ছিলেন। হদিগণ যদি ক্ষত্রিয় হয়, তবে আর তাহারা মুটে মজুরের কাজ করিবে না, উচ্চ শ্রেণীর লোকের বড অসুবিধা হইবে, এই হেতুতে ক্ষত্রিয় করণ কার্য্যে বাধা দেওয়া হইয়াছিল।

(২২শে চৈত্র ১৩২৯ সঞ্জীবনী)

অস্পৃশ্যদের জল তোলার অধিকার দান। দিল্লীর ১৩ই ফেব্রুয়ারীব খবরে প্রকাশ যে, উক্ত দিবস সন্ধ্যাকালে দিল্লীর 'গাজী ভবনের' নিকটে হিন্দু-মুসলমানে একটা ছোটখাট রকমের সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে দুইজন হিন্দু সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে। প্রকাশ যে, তৎপূর্ব্ব দিবস অপরাহ্নে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে এক সভাতে স্থির হয় যে, বহুসংখ্যক অস্পৃশ্যকে হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কূপ হইতে জল তুলিতে দেওয়া হইবে। এই নির্দ্ধারণানুসারে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

ও 'তেজ' পত্রের সম্পাদক মিঃ ডি, গুপ্ত প্রমুখ একদল হিন্দু কতিপয় অস্পৃশ্যকে লইয়া দিল্লীর বিভিন্ন অংশে ঘুরিয়া বেড়ান এবং তাহাদিগের দ্বারা কূপ হইতে জল তোলান। (আনন্দবাজার পত্রিকা)

মাদারিপুর মহকুমার অন্তর্গত কালকিনি থানার প্রায় বিশ সহস্র নমঃশূদ্রের বাস। ঐ নমঃশূদ্র সমাজের কতিপয় নেতা তাহাদিগের ভিতরে কংগ্রেসের বাণী প্রচার নিমিত্ত শ্রীযুত মোহিনীমোহন দাস, রাজেন্দ্রচন্দ্র সেন, ললিতমোহন সেন ও সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে নিমন্ত্রণ করেন। সে মতে বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী সোমবার মোহিনীবাবু প্রভৃতি চর ফতেবাহাদুর গ্রামে উপস্থিত হইলে স্থানীয় নমঃশূদ্রগণ তাঁহাদিগের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন এবং একটি মিছিল বাহির করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ গ্রামের শ্রেষ্ঠ জোতদার শ্রীযুত রামমোহন মণ্ডল মহাশয়ের বাড়ীতে লইয়া যান। তথায় বহু নমঃশূদ্র উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি তাঁহাদিগের সহিত একাসনে উপবেশন করিয়া উপরোক্ত মণ্ডল মহাশয়ের গৃহপক্ক খাদ্য সামগ্রী দ্বারা আহারাদি সমাপন করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হন। সহস্রাধিক হিন্দু-মুসলমান সভায় যোগদান করিয়াছিল; তন্মধ্যে অধিকাংশই মাতব্বর নমঃশূদ্র। (আনন্দবাজার ৬।১১।১৩৩০)

সম্প্রতি দিল্লী, রাইসানায় বাল্মীকি (মেথর)আর্য্য সমাজের বাৎসরিক অধিবেশনে লালা লজপত রায়, স্বামী সত্যানন্দ প্রভৃতি নেতারা যোগ দিয়াছিলেন। সভায় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর পার্শ্বে মেথরদিগকে বসিতে দেখিয়া লালাজী আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি মেথরদিগকে কতকগুলি দোষের পরিহার করিতে উপদেশ দেন। বলেন, মেথররা তাহাদের দোষগুলি পরিত্যাগ করিলে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা আর্য্য সমাজে যোগ দিয়া সহজেই অস্পৃশ্য উদ্ধারে সাহায্য করিতে পারিবেন। মেথরদের সমাজ সংস্কারের জন্য অনেক মেথর বক্তা বক্তৃতা দেয়। সভাশেষে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা মেথরদের হাত হইতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। (বসুমতী ৪।১১।৩০)

২০শে ফাল্গুন পূর্ব্বাহ্নে আর্য্য সমাজের গণ্যমান্ত সভ্য চেৎলানিবাসী শ্রীযুত তুলসীদাস দত্ত মহাশয়ের ৬৫নং আলীপুর রোডস্থিত বাড়ীতে তৎকর্ত্তৃক একটি সদনুষ্ঠানের সূচনা করা হইয়াছে। অস্পৃশ্য হিন্দুদিগকে জল-আচরণীয় করা ও ক্রমশঃ তাহাদিগকে সদাচারী করা এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। শিবচতুর্দ্দশী আর্য্যসমাজের একটি স্মরণীয় পবিত্র দিন। পূর্ব্ব হইতেই নিকটবর্ত্তী কয়েকজন ভদ্রলোকের অনুমোদনে তুলসীবাবু স্থানীয় ধোপাদিগকে ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আহ্বান করিয়া রাখিয়াছিলেন। যথাসময় ধোপীগণ বালকবালিকাসহ প্রায় ২৫জন সমবেত হইলে উপস্থিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, কায়স্থ, বণিক ও নবশাখগণ তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ও সভায় একাসনে বসাইলেন। কালীঘাটের শ্রীযুত হরিদাস হালদার মহাশয় ও তুলসীবাবু শাস্ত্রসাহায্যে বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রাচীন শাস্ত্রে অস্পৃশ্য বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। আমরা নিজেরা নিজেদিগকে বড় মনে করিয়া শিল্পী ও শ্রমজীবীদিগকে সমাজে দাবিয়া রাখিয়াছি তাহার ফল যথেষ্ট ফলিয়াছে। বয়োজ্যেষ্ঠ ধোপীরা তুলসীবাবুর সদনুষ্ঠানের ও সদভিপ্রায়ের জন্য বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট আহ্লাদে প্রতিশ্রুত হইল যে, তাহাদের স্বজাতীয়দিগকে নৈতিক উন্নতি ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে উন্নত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিবে এবং নিজেদের বৃত্তি রক্ষা করিয়া যাহাতে সমাজে সঙ্কোচভাবে না থাকিতে হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। ইহাও ধার্য্য হইল যে, মধ্যে মধ্যে এরূপ মেলামেশা করিবার সুযোগ উভয় পক্ষ হইতে করা হইবে। তুলসীবাবুর বাড়ীতে প্রস্তুত পাকান্ন ধোপী-দিগের হাতদিয়া তাহাদের ও ব্রাহ্মণাদির মধ্যে বিতরিত হইলে সকলেই আনন্দ-সহকারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোজন করিলেন। (বসুমতী)

লালা লজপত রায় নিম্নলিখিত বাণীটী প্রচার করিয়াছেন :—ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা সমূহের অন্যতম সমস্যা হইল নির্য্যাতিত সমাজের উন্নতি বিধান করা। অনুন্নত সমাজের উন্নতি বিধান ব্যতিরেকে স্বরাজ লাভ অসম্ভব না

হইলেও খুব যে কষ্টসাধ্য, তাহা সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি এই যে ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্যের ভাব, নর নারায়ণের প্রতি এই যে নির্ম্মম অবিচার, হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা-দানব ভারতের এক প্রধান অঙ্গকে নির্জ্জীব করিয়া রাখিয়াছে। অসাড় করিয়া একেবারে ভারতদেহ হইতে বাদ দিয়া রাখিয়াছে, ইহাই হইল সমগ্র হিন্দুজাতির তথা ভারতের অনপনেয় কলঙ্কের একমাত্র নিদর্শন; বড়ই আনন্দের বিষয় এই যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানকে সংগঠন-মূলক কার্য্যের অন্যতম অংশ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এবং এ বিষয়ে চেষ্টাও যথেষ্ট করিতেছেন। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, ভারতের হিন্দু মহাসভার কৃপাদৃষ্টিও সম্প্রতি এই নির্য্যাতিত সমাজ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, এবং ভারতের প্রতিষ্ঠাপন্ন ধর্ম্মসংস্কারকগণও এ বিষয়ে যত্নের ত্রুটি করিতেছেন না। যাহাতে এই মহাকার্য্য আরও বিস্তৃতভাবে সম্প্রসারণ লাভ করিতে পারে এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের সে বিষয়ে তৎপর হইতে হইবে। আমি এখন বিলাত চলিয়াছি, আমার এই ভারত ত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের উপদেশ অনুসারে এবং পবিত্র হিন্দু মহাসভার শুভ ইচ্ছার প্রেরণায় আমি উক্ত মহাকার্য্য সাধনের অভিপ্রায়ে একটী কমিটি গঠন করিয়া যাইতেছি। এই কমিটি ১লা এপ্রিল তারিখে আম্বালা হইতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, এবং প্রতি মাসেই লাহোরে ইহাদের একটী করিয়া অধিবেশন হইবে। এই মহাকার্য্য পরিচালনার জন্য কোন মহাপ্রাণ ভদ্রলোকের নিকট হইতে কিছু টাকা পাইয়াছি, এবং ইহাতেই আমার যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। আমি আমার দেশবাসীর সর্ব্বসাধারণের নিকট এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। (হিন্দুস্থান)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে ত্রিবাঙ্কুরের রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ষ্টেট কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যের নিন্দাবাদ করিয়া তার পাঠান হইয়াছে।

অস্পৃশ্য জাতিদিগের যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক তাহাদের বিধিদত্ত ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য সত্যগ্রহ করিতে যাইয়া গ্রেপ্তার হইয়াছে তাহাদিগকে অনতিবিলম্ব মুক্তিদান করিবার জন্য এবং কেবল রাস্তার বাধা নিষেধ নহে পরন্তু কূপ, জলাশয় ও দেব মন্দিরে যাহাতে ইহাদের উপর কোন বাধা-নিষেধ বজায় রাখা না হয়, তাহার জন্যও অনুরোধ করা হইয়াছে। এই গ্রেপ্তারে হিন্দুধর্ম্মের উপরেই আঘাত দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু সভার ব্রাহ্মণগণ আশা করেন যে, অস্পৃশ্য জাতিদিগকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করিয়া হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য রাজপরিবার সচেষ্ট হইবেন। অন্যথা হিন্দুধর্ম্মের স্থায়িত্বের সম্বন্ধে বিশেষ আশঙ্কার কারণ আছে। (হিন্দুস্থান)

ভগবৎ কৃপায় ভারতের সর্ব্বত্র অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও জলচল আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছে। বাংলা দেশের পাবনা জেলার নানা স্থানে এই আন্দোলন বিশেষ ভাবে চলিতেছে। গত শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্বে (১৩৩০) চাটমোহরের নিকট-বর্ত্তী হাট-মোহিনীগঞ্জে রাজসাহীর জমিদার 'জন সেবক' সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেশ নাথ বিশী এম এ, বি এল মহাশয় উদ্যোগী হইয়া একটা বিরাট সভার আয়োজন করেন। নমঃশূদ্র প্রতিনিধিগণের সংখ্যা সহস্রের উপর হইয়াছিল। সভা অন্তে স্থানীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যগণ এবং সভাপতি শৈলেশবাবু সমবেত নমঃশূদ্রগণের জল পান করেন।

গত ২৭শে মাঘ কাওরাইত ষ্টেসনে (ঢাকা) ময়মনসিংহ হিন্দু-হিত সাধিনী সমিতির চেষ্টায় এক সহস্রের উপর কোচ বা খস ক্ষত্রিয় ভ্রাতৃগণ উপবীত গ্রহণ করিয়াছে এবং ময়মনসিংহের হিত-সাধিনী সমিতির পরিচালক ও নেতৃবর্গ তাহাদের জল পান করিয়াছেন ও শ্রোত্রীয় নাপিতগণ ক্ষৌরী কার্য্য করিয়াছেন। পাবনা জেলার সলপ গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদারবর্গ হিন্দুসভা করিয়া নমঃশূদ্র ভ্রাতাদের বাটী গিয়া জল যোগ করিয়াছেন।

গত ৩রা চৈত্র রবিবার বৈকালে স্থল (পাবনা) শ্রীশ্রীহরিভক্তি প্রদায়িনী

সভা প্রাঙ্গণে স্থানীয় স্থলসমাজস্থ হিন্দুগণের এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছে। শ্রীযুত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির পদে আসীন হইলে সিরাজগঞ্জে আগামী প্রাদেশিক কনফারেন্সের সময় সর্ব্ববঙ্গ হিন্দু সভার অধিবেশন আহ্বান করা সঙ্গত বিবেচিত হয়। অতঃপর স্থানীয় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সেবা সমিতির নায়ক শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন রায় তামাই গোপালপুর অঞ্চলে প্রায় ২০০০ দুই হাজার নমঃশূদ্র খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে প্রস্তুত—এই বিষয় স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া তাহাদের রক্ষাকল্পে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সভ্যগণ কর্ত্তৃক উহা সাদরে গৃহীত হয়। অতঃপর শ্রীযুত ফণীলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্ন লিখিত প্রস্তাব কয়টি অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য সমাজকে অনুরোধ করেন ও তাহা অধিকাংশের সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। অনাচরণীয় জাতি গৃহাদিতে প্রবেশানন্তর আহার্য্য স্পর্শ না করিলে তাহা নষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

২। যদি কেহ অনাচরণীয়গণের হস্তে জলপান করে, তবে তাহাকে সমাজে দণ্ডিত করিতে পারা যাইবে না।

৩। নরসুন্দরগণ সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুগণকে ক্ষৌরী করিবেন, ইহাতে তাঁহারা কোনওরূপ হীনতা প্রাপ্ত হইবেন না।

৪। এক কূপ হইতে হিন্দুমাত্রেই জল ব্যবহার করিতে পারিবেন। সর্ব্বশ্রেণীকে পরস্পর জলচরণীয় করার প্রস্তাবটি নিখিল ভারতীয় হিন্দুমহাসভার অনুমতি স্বপক্ষে স্থগিত থাকে ও একমাস কাল মধ্যে তাঁহাদের অনুমতি পাইবার প্রার্থনা করা হয়। সর্ব্বশেষে বিভিন্ন গ্রাম হইতে যোগ্য নেতৃস্থানীয় ২৫ জন ব্যক্তিসহযোগে একটি কর্ম্মীসঙ্ঘ গঠিত হয়। ঐ সঙ্ঘ এক মাস মধ্যে অন্ততঃ এক হাজার সভ্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন ও সেই সভায় জলাচরণীয় বিষয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে। হিন্দুস্থান ১৬ চৈত্র ১৩৩০।

বহুদিন যাবৎ আমরা নমঃশূদ্রাদি জাতির মধ্যে একটা মহা চাঞ্চল্যের ও অশান্তির ভাব লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম। তাহার প্রধান কারণ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের তাহাদের প্রতি সহানুভূতির অভাব ও ঘৃণা। অশিক্ষিত পদদলিত অন্ত্যজ জাতি ব্রাহ্মণাদির মুখাপেক্ষী থাকিয়া নিরাশ হইয়াছিল। পদে পদে তাহারা তিরস্কৃত, ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হইয়াছে। কয়েকটি অন্ত্যজ হিন্দুসন্তান পাদ্রিদের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত ও প্রলোভিত হহয়াছিল, তাহারাই সমস্ত অন্ত্যজকে ধর্ম্মান্তরিত করিবার জন অনুপ্রাণিত করিতেছিল। বিষয়টি ক্রমে জটিল হইতে থাকে। উপর্য্যুপরি আমরা ৩।৪ খানা পত্র পাইয়া গত ৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা হইতে সিরাজগঞ্জ রওনা হই। বুধবারে প্রাতে সিরাজগঞ্জ পৌঁছাই। সেই দিন তিনটি সভায় ঐ সকল বিষয়ের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার চলে। উভয় পক্ষের নানা প্রকার শাস্ত্রীয় ও লৌকিক দেশাচার সম্বন্ধে বহু প্রসঙ্গের পর, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ঐ সকল অন্ত্যজকে জলচল করা, ধোপা ও নাপিতের বন্দোবস্ত করা ও নানাপ্রকার সহানুভূতি প্রদর্শনই আমাদের উচ্চবর্ণের উপস্থিত কর্ত্তব্য। ঐ দিবস স্থির হয়, ১৩ই এপ্রিল রবিবার চৈত্র সংক্রান্তির দিবস গোপালপুর নামক নমঃশূদ্র প্রধান গ্রামে এক সভা হইবে। তথায় আমরা উক্ত প্রস্তাবের প্রথম দ্বারোদ্ঘাটন করিব। পার্শ্ববর্ত্তী বহুগ্রামে পত্রপ্রেরণ ও লোক মারফতে খবর পাঠান হইল। চৈত্র সংক্রান্তির দিবস সদলবলে "জামতৈল ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। গ্রাম হইতে পূর্ব্ব হইতেই আমাদের স্বাগত করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার পতাকা হস্তে যুবক, বালক প্রভৃতি ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাহারা সকলে আসিয়া আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিল। আমরা সমস্বরে 'জয় গুরু মহারাজ কি জয়', বলিয়া রওনা হইলাম। প্রায় ১২টার সময় আমরা উক্ত গ্রামে উপস্থিত হইলাম। আমরা একটু বিশ্রাম করিয়া তাহাদের সকল প্রকার

অভাব অভিযোগ শুনিতে লাগিলাম। শুনিতে শুনিতে হৃদয় বাস্তবিকই করুণ রসে ভরিয়া যাইতে লাগিল,—"আমরা হিন্দু, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের আমরা কিছুই জানি না, আমাদের কেহই সে বিষয়ে শিক্ষা দেয় না। একই কূপ হইত ব্রাহ্মণ মুসলমান জল লয়, কিন্তু আমরা সে অধিকার হইতে বঞ্চিত। আমরা ধোপা নাপিত পাই না, কাহারও বাটিতে যাইলে ঘৃণাভরে তাড়াইয়া দেয়। আমাদের ছেলেরা বোর্ডিংএ স্থান পায় না, ব্রাহ্মণ কায়স্থের নিকট চাকরি পায় না, আমাদের ব্যথার ব্যথী কেহই নাই, আমাদের কোথাও আশ্রয় নাই। আপনারা আমাদের সাহায্য করুন। এই প্রকার নিরাশ্রয়ে সহানুভূতি শূন্য হইয়া কোন অশিক্ষিত জাত কতকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। [illegible]শায় আশায় যণ্ডাও প্রত্যাশী বকের ন্যায় বহুকাল চলিয়া গিয়াছে, আমাদের উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইল না, তাই আমাদের মধ্যে এই চাঞ্চল্য।"

প্রায় বেলা ৩টার সময় সভা আরম্ভ হইল। শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ-বৈদ্য বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। অন্ত্যজ জাতিতে সভা পূর্ণ হইয়া গেল। সভায় প্রফেসর নাইডু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী, হেমচন্দ্র দত্ত, শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী, সত্যেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্বামী করুণানন্দ প্রভৃতি বক্তৃগণ মহাসমন্বয়ের প্রবাহ চালাইতে থাকেন। নমঃশূদ্রদের জনৈক প্রতিনিধি যশোহর হইতে আসিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহাদের আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা খৃষ্টান হইবার পক্ষে ছিলেন এবং যাঁহারা বাস্তবিই হিন্দুধর্ম্মে দৃঢ় ছিলেন, তাহাদের উভয়পক্ষের কথা শুনা হইল। তৎপরে রাত্রি ৯টার সময় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে তাঁহাদের হস্ত হইতে জল মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করা হইল এবং "জয়, গুরু মহারাজ কি জয়" শব্দে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইতে লাগিল। কেবল দুইটি ভদ্রলোক জলগ্রহণ করিতে অনত করিলেন, কিন্তু অভিভাবকদিগের অজুহত তুলিয়া জানাইলেন যে যাহারা জলগ্রহণ করিবে তাহাদের সহিত পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং তাহারা

ভবিষ্যতে কোন বিরোধী হইবেন না। স্বামী করুণানন্দ। (দৈনিক বসুমতী বৈশাখ ১৩৩১)

ভাই হিন্দু, আর ঘৃণা করিও না। সাত শত বৎসর ধরিয়া পরাধীনতার অপমান ভোগ করিয়াও—বুঝিব গত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। আর পাপ বাড়াইও না। সাত শত বৎসরের বিদেশী বিজাতি বিধর্ম্মীর লা জুতায় যাহাদের জাত যায় নাই—স্বদেশী স্বজাতীয় স্বধর্ম্মাবলম্বী অনুগত সরল সেবক ভাইদের জল পানে সে জাত যাইবে না। গোলামের আবার জাতি বংশ বিদ্যা ধনের গর্ব্ব কিসের। জাতি কুল মান ইজ্জৎ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। মিথ্যা সামাজিকতা ও ঝুটা ব্যবহারিকতা ত্যাগ কর। জাতির অভিমান মহাপাপ। এই মহাপাপ যতক্ষণ, যত . সেহ করিবে ভগবৎ ভক্তিতে ততদিন বঞ্চিত থাকিবে। এই জাতির মিথ্যা মান ত্যাগ হইয়া সেই মাত্র সর্ব্বজাতিতে বা প্রাণীতে সমবুদ্ধি আসিবে—তখনই এ জাতির উদ্ধার তখনই তুমি দুর্লভ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। কলি পাবনাবতার প্রেমসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীমুখে বলিতেছেন :—

প্রভু বলে যে জন ডোমের অন্ন খায়।
কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্ব থায়॥

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত অন্ত খণ্ড।)

